কেমন করে স্বাধীন হলাম



ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রকের শিক্ষা বিভাগের জনশিক্ষণ নিলয়মের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী রচিত।

কেমন করে স্বাধীন হলাম

[১ম ও ২য় পর্ব একত্রে]

শিশিরকুমার চক্রবর্তী
জাতীয় সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক

দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
অলক মুখোপাধ্যায়
দি বুক ট্রাস্ট
৫৭-বি কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : ২রা অক্টোবর, ১৯৮৮

মূল্য : চোদ্দ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীস্বপন কোলে
নিউ মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আজন্ম জ্ঞানার্থী

শ্রদ্ধেয়—

শ্রীভবতোষ পাল এম. এস.

প্রাক্তন অতিরিক্ত কৃষি-অধিকর্তা,

পশ্চিমবঙ্গ-কে

এই বইখানি

উৎসর্গ

করলাম।

শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী

বড়শূল : বর্ধমান

অক্টোবর—১৯৮৮

বইটিতে আছে

[১ম পর্ব]

বিষয়		পৃষ্ঠা
কেমন করে স্বাধীন হলাম	...	১
ভারতবর্ষ দেশ আমাদের	...	১
কত মানুষের ধারা	...	৩
ভারতের আদিবাসী	...	৪
তারপর এল নতুন পাথরের যুগ	...	৪
তারপর এল ধাতুর যুগ	...	৫
মাটির তলায় লুকিয়েছিল	...	৫
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য	...	৮
জাতিভেদের শুরু	...	৯
চারি বেদের কথা	...	১২
যারা আর্য, তারাই হিন্দু	...	১৩
বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম	...	১৬
ভগবান বুদ্ধের কথা	...	১৭
মহাবীর বর্ধমান	...	২১
কত না বিদেশী এসেছিল দেশে	...	২৩
এক সন্ন্যাসী সম্রাটের কাহিনী	...	২৭
কহেন কবি কালিদাস	...	২৯
গুপ্তযুগের পরের কথা	...	৩১
ভোজবাজির মিহিরভোজ	...	৩৪
প্রথম বাঙালী সম্রাট	...	৩৫
নির্বাচিত গৌড়রাজ গোপাল	...	৩৬
সেন বংশের কাহিনী	...	৩৯
এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল	...	৪১
কয়েকটি পাঠান রাজবংশ	...	৪৪
পাঠান আমলে বিদেশী অভিযান	...	৪৫
মেয়ে সুলতান রাজিয়া	...	৪৬
শ্বশুর ঘাতক সুলতান	...	৪৭
খামখেয়ালী সুলতানের কাহিনী	...	৪৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
এসেছে মোগল	...	৫১
শাহী সড়কের শেরশাহ	...	৫৪
আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান	...	৫৭
রক্ত সিংহাসনে ঔরঙ্গজেব	...	৬২
পাহাড়ী ইঁদুর শিবাজী	...	৬৩
শেষের সেই দিনগুলি	...	৬৭

[২য় পর্ব]

সাগর পারের বিদেশী বণিকেরা	...	৬৯
এস এস আজ তুমি ইংরাজ	...	৭১
পলাশী! হায় পলাশী!	...	৭৭
পলাশীর পরে	...	৮০
নন্দকুমারের ফাঁসি হল	...	৮২
সিপাহী বিদ্রোহ	...	৮৫
সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী	...	৯০
বিপ্লবে বাঙালী	...	৯৪
আত্মার সারথি কংগ্রেস	...	৯৯
অহিংস আন্দোলনের গোড়াপত্তন	...	১০০
রাখীবন্ধন	...	১০৩
স্বদেশী আন্দোলন	...	১০৪
বঙ্গভঙ্গের পরে	...	১০৬
অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা	...	১০৮
চৌরিচৌরায় কাহিনী	...	১১০
আইন অমান্য আন্দোলন	...	১১১
ভারত শাসন আইন	...	১১৫
আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা	...	১১৭
করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে	...	১১৮
নৌ-সেনা বিদ্রোহ	...	১২১
ছে'চল্লিশের দাঙ্গা	...	১২২
ওরে নতুন যুগের ভোরে	...	১২৪

প্রথম পর্ব

পাতা ১ হইতে ৬৮

[প্রথম পর্ব]

কেমন করে স্বাধীন হলাম

পনেরই আগস্ট ; উনিশশো সাতচল্লিশ সাল।

ঐদিন আমরা স্বাধীন হই। তার আগে আমরা অনেক দিন পরাধীন ছিলাম। প্রায় দুশো বছর।

আমরা কাদের অধীন ছিলাম ? কেমন করে তাদের অধীন হলাম ? কেমন করে স্বাধীন হলাম ?

সে এক মজার কথা শোন-শোন, শুনলে অবাক হবে।
সে কাহিনী, যেমন জানি, বলছি, শোন সবে ॥
সোনার ভারত, সোনার ভারত, আমরা ভারতবাসী।
ভারত কথা, শুনে সবার, মুখে ফুটুক হাসি ॥

ভারতবর্ষ দেশ আমাদের

এই তো রয়েছে পরপৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের মানচিত্র। আমাদের দেশের ছবি।

ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। দেশের উত্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় পাহাড়। দেশের তিনদিক ঘিরে সাগরের তরঙ্গভঙ্গ।

কেউ কি জানি—

কে দিলরে, এই দেশেরই, নামটি ভারতবর্ষ।
যে নাম শুনে, তোমার আমার, মনে জাগে হর্ষ ॥

সে কয়েক হাজার বছর আগের কথা। আমাদের দেশে এক যে ছিল রাজা। তার নাম ভরত। আর—

পুরাণ কথা, কাব্য-গাথা, কাহিনীতে শুনি।
ভরত ছিলেন, বড়ই দয়াল, প্রজা-দরদী, গুণী ॥

আপন ছেলের মত প্রজাপালন করতেন তিনি। তাঁর শাসনে প্রজারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাত। রাজা ভরতের নামেই দেশের নাম হল ভারত। কিন্তু শুধু ভারত না বলে ভারতবর্ষ বলা হয় কেন ?

বর্ষ মানে বছর। কিন্তু বর্ষ কথাটির আর একটি মানেও আছে।

আগেকার দিনে পাহাড় দিয়ে দেশের সীমানা ঠিক করা হত। পাহাড় দিয়ে সীমানা ঠিক করা হয় বলে এলাকাকে বলা হত—বর্ষ।

ভারত ছিল, হিমালয়ের এপারে। তাই হিমালয়ের এপারের এলাকাটির নাম দেওয়া হয়েছিল—ভারতবর্ষ।



ভরতের আগেও তো দেশে রাজা ছিল। লোকজনও বাস করত। তখন দেশের নাম কি ছিল?

তখন এদেশের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। সেই ছড়াটির কথা মনে আছে তো?—

জম্বুদ্বীপের সব কবি গায় গান।
অম্বিকা বিশ্বাস ভারি বিদ্বান॥

জম্বু মানে জাম। দ্বীপ মানে চারিদিকে জল দিয়ে ঘেরা স্থলভূমি। ভারতের তিনদিকই সাগরের জল দিয়ে ঘেরা। ভারতকে তাই দ্বীপই বলা হত। আর এখানে হয়ত মেলাই জামগাছ ছিল। তাই দেশের নাম হয়েছিল জম্বুদ্বীপ।

মাটির এই পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। পৃথিবী সাগর মেখলা; সাগরের জল দিয়ে ঘেরা। পৃথিবীকে তাই আগে দ্বীপই বলত।

সেকালে পৃথিবীর দেশগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পৃথিবীকে তাই বলা হত—সপ্তদ্বীপা পৃথিবী।

ভারতের নাম ছিল জম্বুদ্বীপ। তেমনি পারস্য দেশের নাম ছিল শাকদ্বীপ। আর ইউরোপকে শ্বেতদ্বীপ বলা হত। পুরানো বইপত্র ঘাটলে, এরকম অনেক মজার কথা জানা যায়।

শুনলে তো—আমাদের দেশের নাম কেন ভারতবর্ষ?

ভরত ছিলেন, মহান রাজা,
তুলনা তার নাই।
তার নামেতে, দেশেরই নাম
ভারত হল তাই ॥

কত মানুষের ধারা

ভারতে নানা জাতির মানুষ বাস করে। কারও গায়ের রঙ ফরসা। কারও গায়ের রঙ কাল। কারও গায়ের রঙ তামাটে।



নানা জাতির মানুষ—মুসলমান, বিহারী, উড়িয়া, সাঁওতাল, গুজরাটী, পার্শি, লেপচা, বাঙালী

কেউ-বা হিন্দু। কেউ-বা মুসলমান। কেউ-বা খৃীস্টান। কেউ

বাঙলা ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা হিন্দী ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা উর্দু ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা তামিল ভাষায় কথা বলে। কেউ-বা গুজরাটি ভাষায় কথা বলে।

আলাদা গঠন, আলাদা গড়ন, রকমারি সব ভাষা।
আলাদা আচার-আচরণ নিয়ে হেথা বাস করে খাসা ॥

এত জাতের, এত ধর্মের, এত ধরনের, এত ভাষাভাষী মানুষ কোথা থেকে এল ?

গুণী পাঠক! সে কথাটি জানতে যদি চাও।
দেশের আদিবাসী কারা, আগে জেনে নাও ॥

ভারতের আদিবাসী

আদিবাসী কথাটির মানে কি ? আদি মানে আগে। বাসী মানে যারা বাস করে। আদিবাসী মানে যারা আগে থেকে বাস করছে।

সে তো হাজার হাজার বছর আগের কথা। আমাদের দেশে তখনও অনেক মানুষ বাস করত। সেই আদিম মানুষেরা বনে-জঙ্গলে বাস করত। তাদের গায়ের রঙ ছিল কাল। মাথার চুল কোঁকড়ানো। নাক চ্যাপ্টা। গড়ন বেঁটে খাটো। তারা ছিল অর্ধ সভ্য। তারা চাষ করতে জানত না। আগুনের ব্যবহার জানত না। ধাতুর ব্যবহার জানত না। ঘর বাঁধতে জানত না। তাই গুহায় বাস করত।

তারা বনের ফল-মূল যোগাড় করে খেত। পশু-পাখি শিকার করে কাঁচা মাংস খেত। তারা দল বেঁধে বাস করত। পাথরের তৈরী অস্ত্র দিয়ে শিকার করত।

এই যুগের লোকেদের বলা হয়—পুরানো পাথরের যুগের মানুষ।

তারপর এল নতুন পাথরের যুগ

এ যুগের মানুষ, আগের তুলনায় সভ্য ছিল। তারাও পাথরের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। এগুলির গড়ন উন্নত ছিল। মেজে-ঘষে এগুলিকে তারা মসৃণ ও চক্চকে করে নিত।

তারা চাষ-আবাদ করত। পশুপালন করত। আগুনের ব্যবহার জানত। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত না। তারা গুহার দেওয়ালে রং করা ছবি আঁকতে পারত।

তাদের অনেক উপজাতি ছিল। এক-এক উপজাতি এক-একটা এলাকা দখল করে থাকত।

এই এলাকাগুলিকে গ্রাম বলা হত। গাঁয়ের সীমানার চারপাশে, বেড়া বা পাঁচিল দেওয়া হত। গাঁয়ে ঘর বেঁধে বাস করত সবাই। তারা নিজেদের ভেতর থেকে একজন সর্দার ঠিক করত। সর্দার গ্রাম শাসন করত।

গাঁয়ের পাঁচজন লোক বা পঞ্চর কথামত সর্দারকে কাজ করতে হত।

তারপর এল ধাতুর যুগ

ক্রমশঃ মানুষ আরও সভ্য হল। তারা ধাতুর ব্যবহার শিখল।

এ যুগে ভারতে দ্রাবিড় জাতের মানুষেরা বাস করত। তারা ভারতের দক্ষিণ দিকের দেশগুলিতে বাস করত।

তামিল, তেলেগু, মালয়ালী এইসব ভাষাকে দ্রাবিড় ভাষা বলে।

দ্রাবিড়রা উন্নত জীবনযাপন করত। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত।

এ যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ চালু ছিল। দ্রাবিড়রা, নৌকা, জাহাজ—এইসব জলযান ব্যবহার করত। ভূতপ্রেত, গাছপালা, দেব-দেবীর পুজো করত।

মাটির তলায় লুকিয়েছিল

জাতীয় সঙ্গীতে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর নাম আছে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে মাটির তলায় দুটি শহর চাপা পড়েছিল। মাটি খুঁড়ে সেই শহর দুটির খোঁজ পাওয়া গেছে।

সিন্ধুতে মহেনজোদারো,
পাঞ্জাবে হরপ্পা।
দু'টি শহর সেথায় ছিল
মাটির তলায় চাপা॥

সরিয়ে মাটি পাওয়া গেল
তাদেরই নিশানা।
সেই যুগের রকমারি
খবর গেল জানা॥

কি জানা গেল? সে যুগের মানুষেরা—

জানত ভাল গড়তে শহর, রাস্তা বড় বড়।
দু' তিন তলা দালান বাড়ি গড়তে ছিল দড়॥

বাড়িগুলি পোড়ামাটির ইটের তৈরী। তারা ফসল রাখার জন্য গোলাঘর তৈরী করত। বাড়ির দেওয়াল ও মেঝে পালিশ করতে জানত।

তারা ইটের তৈরী কুয়া তৈরী করতে পারত। উপরে ঢাকনা দেওয়া পাকা নর্দমাও তৈরী করেছিল।

তারা তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। শহর দুটিতে লোহার তৈরী জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি। মনে হয় তারা লোহার ব্যবহার জানত না। তারা—

মাছ মাংস দুধ খেজুর খেত যব গম
পশমী ও সুতীর পোশাক পরত মনোরম।
স্ত্রী পুরুষে রাখত মাথায় লম্বা লম্বা চুল,
পেঁচানো খোপায় চুল বাঁধত, পরত কানে দুল।
সোনা রূপা পাথরের পরত অলংকার,
প্রসাধন দ্রব্য নানা করত ব্যবহার।

তারা পোড়া মাটির থালা, কলসী, জার এসব তৈরী করতে পারত। মাটির নানারকম খেলনা ও পুতুল তৈরী করতে জানত।

তারা গরু, মোষ, উট, ভেড়া এসব পশুপালন করত। তবে ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। নৌকা ও জাহাজের ব্যবহার জানত।

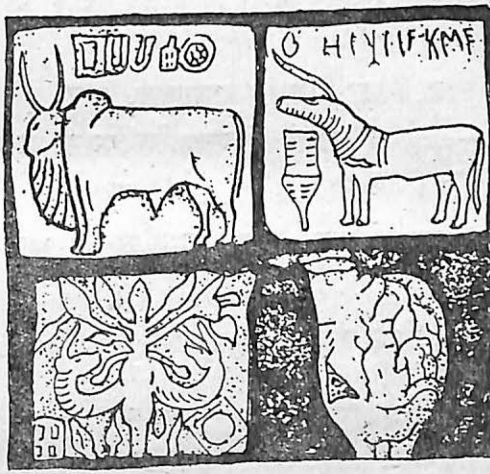
তারা লিখতে পারত। তাদের লিপিমালা ছবির মতন আঁকা। ঐ দুটি জায়গায় সেকালের অনেক সীলমোহর পাওয়া গেছে। তাতে ঐ লিপি খোদাই করা আছে। এই লিপির নাম সিন্ধুলিপি। সিন্ধুলিপি ভারতের আদিলিপি।

তারা শিবের, মাতৃকাদেবীর, গাছ, জল, আগুনের পুজো করত।

তাদের সমাজে জাতিভেদ ছিল না। তবে গরীব বড়লোকের ভেদাভেদ ছিল। শহরের বাড়িঘর দেখে তাই মনে হয়।

সিন্ধুনদ এলাকায় শহর দুটি গড়ে উঠেছিল। তাই এই সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা বলা হয়।

কত বছর আগে এই শহর দুটি গড়ে উঠেছিল ? তা নিয়ে পন্ডিতেরা অনেক বিচার-বিবেচনা করেছেন। তাদের মতে—



সিন্ধুলিপি

আজ থেকে প্রায় পাঁচটি হাজার বছর আগেকার
শহর দুটি ; শুনতে অবাক লাগে যে সবার।

শহর দুটি কেন মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল ? তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

কেউ বলেন—গাছ কেটে ইট পোড়ান হত। ফলে বন উজাড় হয়ে যায়। বৃষ্টিপাত কমে যায়। ফলে গ্রাম ও শহরগুলি মরুভূমি হয়ে যায়। লোকজন গ্রাম ও শহর ছেড়ে পালায়।

কেউ বলেন—বাঁধ দিয়ে বানের জল আটকে রাখা হত। বিদেশী জাতির লোকেরা এসে বাঁধ নষ্ট করে দেয়। সেচের অভাবে চাষবাসের

জমি পতিত থাকে। খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। লোকজন গ্রাম ও শহর ছেড়ে পালায়।

কেউ বলেন—পলি পড়ায় নদীগর্ভ ভরাট হয়ে আসে। ফলে বানের জল শহরে ঢুকতে থাকে। লোকজন শহর ছেড়ে চলে যায়।

কেউ বলেন—ভূমিকম্পে শহর দুটি মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কেউ বলেন—বিদেশী জাতি এসে শহর দুটি দখল করে নেয়। তার পরে পরেই বান, ভূমিকম্প এসব দুর্যোগ ঘটে। তার ফলে শহর দুটি ধ্বংস হয়। শহরের লোকজন মারা পড়ে।

সবারই কথা কিছু কিছু ঠিক। জলাভাব, বান, ভূমিকম্প, বিদেশী জাতির আক্রমণ—এসবের ফলেই শহরগুলি ধ্বংস হয়। সব শহর একসাথে ধ্বংস হয়নি। আবার হঠাৎ গোটা শহর ধ্বংস হয়ে যায়নি। নানাকারণে নানা শহরের নানা অংশ ধ্বংস হয়। পরে মাটির তলায় চাপা পড়ে যায়।

এ শহরে কোন্ জাতির মানুষ বাস করত? তাও সঠিক জানা যায়নি।

হেথায় আর্য হেথা অনার্য

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার পাঁচশ বছর আগেকার কথা।

রাশিয়ার কিরগিজ এলাকায় একদল মানুষ বাস করত। তারা চাষবাস করত না। গো-পালনই ছিল তাদের জীবিকা। মেষপালনও করত। তারা ঘোড়ায় চাপতে জানত। তারা ঘোড়ায় টানা রথ ব্যবহার করত।

তারা ছিল যাযাবর। পশুর পাল নিয়ে তারা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

ঘুরতে ঘুরতে তারা ভারতবর্ষে এসে ঢুকে পড়ল। ভারতের উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ পাহাড়। সেই পাহাড়ের ভিতরে যাতায়াতের পথ আছে। সেই গিরিপথ ধরে এই নতুন জাতি ভারতে এসেছিল।

প্রথমে তারা আফগানিস্থান থেকে পাঞ্জাব, এই বিরাট এলাকা জুড়ে বাস করে। পরে এখানে থেকে সারা দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ল।

তারা সহজে এ দেশ দখল করতে পারেনি। আদিবাসী জাতিরা তাদের জোর বাধা দিয়েছিল। তাদের সাথে আদিম অধিবাসীদের অনেক লড়াই হয়।

এই নতুন জাতি ঘোড়া ও রথে চেপে যুদ্ধ করত। যুদ্ধে লোহার অস্ত্র ব্যবহার করত। তাই সহজে তারা আদিম অধিবাসীদের হারিয়ে দেয়।

আদিবাসীদের ভেতরে নানা উপজাতি ছিল। কয়েকটি উপজাতি নতুন জাতির বশ মেনে নেয়। কয়েকটি উপজাতি তাদের বশ মানতে চায়নি। তারা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

এই নতুন জাতির গায়ের রঙ ছিল ফরসা। তাদের দেহের গড়ন বেশ লম্বা ছিল। নাক ছিল খাড়া। কপাল ছিল বেশ চওড়া। মাথার চুলগুলি ছিল সোনালী রঙের।

তারা ভাল খাওয়া-দাওয়া করত। ভাল পোশাক-আসাক পড়ত। তাদের আচার-আচরণও ভাল ছিল।

সবদিক থেকে তারা নিজদিগকে সকলের চাইতে সেরা মনে করত। তাই তারা নিজেদের আর্য বলত। আর্য মানে সবার সেরা।

এদেশের আদিবাসীদের তারা খুব ঘৃণা করত। তাদের দাস, দস্যু, রাক্ষস এসব বলত। ইতিহাসে এদেরই অনার্য বলা হয়। অনার্য মানে —যারা আর্য নয়।

অনার্যদের অনেক আচার-আচরণ পরে আর্যরা মেনে নেয়। এয়োতী মেয়েদের হাতে নোয়া পরা ও সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া অনার্য রীতি। গাছপালা, পাথর পূজা এসবও অনার্য রীতি।

দ্রাবিড় জাতির লোকেদের দেখাদেখি আর্যদের ভেতরেও শিবপূজা, লিঙ্গপূজা ও মূর্তিপূজা শুরু হয়।

জাতিভেদের শুরু

আদিবাসীদের ভেতরে জাতিভেদ ছিল না। আগে আর্যদের ভেতরেও জাতিভেদ ছিল না। পরে জাতিভেদ শুরু হয়।

আর্যরা সবসময় অনার্যদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইত। তাদের সাথে মেলামেশা করতে চাইত না। অনার্যদের সবকিছু থেকে নিজেদের তফাত রাখতে চাইত।

জাতিভেদ চালু হওয়ার এটাও একটা কারণ। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল—

আর্যসমাজে লোকসংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছিল। লোকসংখ্যা বেড়ে গেলেই খাবারে টান পড়ে। চাহিদা মেটাতে মানুষ নানা উপায়ে রুজি-রোজগার করতে চায়। কেউ-বা নিজের পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরে। কেউ-বা একসাথে দু'তিনটি পেশা ধরে বাড়তি উপায়ের পথ খোঁজে। আর্যদের ভেতরেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। ফলে আর্যসমাজে নানারকম গোলযোগ দেখা দেয়। তা রদ করতে জাতিভেদ চালু করা হয়।

গুণ ও কাজের বিচারে এক এক দল মানুষের এক এক জাত ঠিক করা হয়েছিল। যেমন ঃ—

পূজা-আরাধনা, ধর্ম-কর্ম পঠন-পাঠন	ব্রাহ্মণ
দেশ জয়, দেশরক্ষা, যুদ্ধ	ক্ষাত্রিয়
চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, শিল্পকাজ	বৈশ্য

তাহলে কাঠ কাটা ; মাটি কোপান ; জমি চষা ; নদীতে বাঁধ দেওয়া ; নালা কাটা ; জল তোলা এসব কাজ ; এসব খাটা-খাটনির কাজ কারা করত ?

কেন ? হেরে গিয়ে বশমানা অনার্যরা। তাদের বলা হল—শূদ্র।

এ ভাবে সমাজের মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল।—ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

জাতিভেদ আগে বংশগত ছিল না। পরে তা বংশগত হয়ে পড়ল। বামুনের ছেলে পঠন-পাঠন না করলেও সে বামুন। গো-মুখ্যু বামুনের

ছেলে চায়ের দোকান দিলেও সে বামুনই থাকে। জাত বদলে বৈশ্য হয়ে যায় না। আবার চাষী কি বণিকের ছেলের হাজার গুণ থাকলেও বামুন হতে পারে না।

প্রথমে চারি জাতির ভেতর বিয়ে হত। পরে জাতিভেদ নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়। ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়।

শূদ্রদের কথা না বলাই ভাল। ঐ তিনটি জাতের লোক তাদের খুব ঘৃণা করত। তাদের ছুঁয়ে ফেললে স্নান করে শুচি হত। তাঁদের ছোঁওয়া কোন জিনিস খেত না।

তাঁরা গাঁয়ের একেবারে বাইরের দিকে থাকত। তারা ঐ তিনটি জাতি পূজা আরাধনায় যোগ দিতে পারত না।

তারা দিন আনত, দিন খেত। কোন রকমে দিন কাটাত। কথায় কথায় তাদিকে অপমান করা হত। তাদের লেখাপড়া শেখার অধিকার ছিল না। তাদের দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না। উপরতলার মানুষরা তাদিকে নানা ভাবে শোষণ করত। তারা তা মুখ বুজে হজম করত।

এখনকার বাঙালী সমাজে বামুন, কায়েত, বদ্যি, সদ্‌গোপ, ধোপা, নাপিত—এসব জাতির নাম শোনা যায়। দুলে, বাগদি, বাউড়ি, মুচি—এসব জাতের লোকও আছে। আবার সাঁওতাল, কোঁড়া, ওঁরাও—এরাও বাস করে। এরা ভারতের বশ না-মানা আদিম অধিবাসীদের বংশধর।

প্রথম থাকের লোকেদের বলা হয় বর্ণ হিন্দু। এই থাকের বামুন ও ও বদ্যি ছাড়া আর সব জাতের লোকেদের চলতি কথায় বলা হয় শূদ্র।

দ্বিতীয় থাকের লোকেদের বলা হয়—অনুন্নত হিন্দু।

তৃতীয় থাকের লোকেদের বলা হয়—আদিবাসী।

আর্য সমাজের জাতিভেদের সঙ্গে এই ধরনের জাতিভেদের অনেক তফাত।

পরে বাঙালী হিন্দুদের ভেতরে এরকম জাতিভেদ চালু হয়েছিল।

চারি বেদের কথা

ধারাপাত পড়ার সময় বলা হয়—একে চন্দ্র। দুয়ে পক্ষ। তিনে নেত্র। চারি বেদ।

এই চারটি বেদের নাম—ঋক্‌বেদ, সাম্‌বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ।

সব আগে ঋক্ বেদ রচিত হয়। সব শেষে রচিত হয় অথর্ববেদ।

বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। বেদ আগে লিখে রাখা হত না। মুনি-ঋষিরা বেদের শ্লোক বা মন্ত্রগুলি মুখস্থ রাখতেন। শিষ্য বা ছাত্ররা তা শুনে বার বার বলত। বার বার বলায় তা মুখস্থ হয়ে যেত। অনেক পরে বেদ লিখে রাখা হয়।

বেদে আর্যধর্মের কথা লেখা আছে। ধর্মকথা ছাড়াও বেদ থেকে সমাজ-নীতি, রাজ-নীতি, যুদ্ধ-নীতির কথা জানা যায়। আর্যরা বেদের বিধান মেনে জীবনযাপন করত। আর্যযুগকে তাই বৈদিক যুগ বলা হয়।

বেদ পাঠ করলে জানা যায়—ঈশ্বর এক। সব দেব-দেবী ঈশ্বরের অংশ। গাছপালা, আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য সবকিছুর ভেতরে ঈশ্বর আছেন।

আকাশে বাতাসে আছ, অগ্নিমাঝে, পাহাড়ে, সাগরে।
চন্দ্র সূর্য মাঝে আছ, আছ তুমি সবার অন্তরে॥

আর্যরা প্রথমে চাঁদ, সূর্য, আকাশ, আগুন—এ সবের পূজা উপাসনা করত। পরে নানা দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। প্রথমদিকে উপাসনার নিয়ম খুব সরল ছিল। পরে তা দিনে দিনে জটিল হতে থাকে। নানা রকম হোম, যাগযজ্ঞ করা শুরু হয়। যাগযজ্ঞ একা একা করা যেত না। সেজন্য অনেক পুরোহিত দরকার হত। একদল পুরোহিত মন্ত্র পড়ত। একদল পুরোহিত সামগান করত। একদল পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিত। যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হত। আর্যরা বিশ্বাস করত—যজ্ঞে দেবতারা খুশী হলে সুখ সম্পদ ভোগ করা যায়। দেবতারা খুশী না হলে, দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। যজ্ঞ করলে মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। সুবৃষ্টি হলে শস্যের ফলন ভাল হয়। আর্য-

সমাজে যজ্ঞের খুবই কদর ছিল। তাই পুরোহিতদের দাপট খুব বেড়ে গিয়েছিল। পুরোহিতরা ধর্মকর্ম নিয়ে নতুন নতুন বিধান চালু করতে থাকে। রাজারাও পুরোহিতদের কথামত চলত। তাদের চটাতে সাহস করত না। কিন্তু পুরোহিতদের এ দাপট বেশীদিন থাকল না। লোকে বেদ, যজ্ঞ পুরোহিতদের চালু করা বিধান—এ সব মানতে চাইল না। সমাজে একটা বিরোধ দেখা দিল। বিরোধীরা জটিলতা থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে লাগল। তার ফলে দেশে দুটি নতুন ধর্মের উদয় হল। একটির নাম জৈনধর্ম। অপরটির নাম বৌদ্ধধর্ম।

বৈদিক যুগের শেষদিকে দুটি মহাকাব্য লেখা হয়। একটির নাম রামায়ণ। অপরটির নাম মহাভারত। এই দুটি ধর্মের কথা পরে বলা হবে।

ঋষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেন। মহাভারত রচনা করেন মহর্ষি বেদব্যাস বা ব্যাসদেব।

মহাকাব্য দুটি পদ্যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়।

কবি কৃত্তিবাস বাঙলা পদ্যে রামায়ণ রচনা করেন। কবি কাশীরাম দাস বাঙলা পদ্যে মহভারত রচনা করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা।

রামায়ণ, মহাভারতে বৈদিক যুগের শেষদিকের কথা লেখা আছে। এ যুগকে তাই মহাকাব্যের যুগ বলা হয়। এই সময় অনেক পুরাণ কাহিনী রচিত হয়। এ যুগকে তাই পৌরাণিক যুগও বলা হয়ে থাকে।

যারা আর্য, তারাই হিন্দু

যারা আর্য পরে তারা হয়ে গেল হিন্দু। তাদের ধর্মের নাম হয়ে গেল—হিন্দুধর্ম। আর ভারতবর্ষের নাম হয়ে গেল হিন্দুস্তান।

এ রকম নামের হেরফের হওয়ার মূলে একটা ঘটনা আছে। সেই ঘটনার কথা বলি।

ইউরোপ নামে একটি মহাদেশ আছে। সেই মহাদেশের একটি দেশের নাম গ্রীস। গ্রীসের লোকেদের বলা হয় গ্রীক। গ্রীসের এক এলাকার নাম ম্যাসিডন।

ম্যাসিডনের এক যে ছিল রাজা। তাঁর নাম ফিলিপ। ফিলিপ মারা গেলেন। তাঁর ছেলে আলেকজাণ্ডার ম্যাসিডনের রাজা হলেন। তাঁর বয়স তখন কুড়ি বছর।

আজ থেকে মোটামুটি তেইশ শো বছর আগের কথা—

আলেকজাণ্ডার রাজা হয়ে।
বেরিয়ে পড়েন দিগ্বিজয়ে॥

পৃথিবীর নানা দেশ জয় করার নাম দিগ্বিজয়।

বিরাট সেনাদল নিয়ে আলেকজাণ্ডার চললেন এগিয়ে। মিশর পারস্য—এসব দেশ জয় করে তিনি ভারতে এসে পেঁছালেন।



আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ পাহাড়ে গিরিপথ ধরে ভারতে এসেছিলেন। সিন্ধুনদ পার হয়ে তিনি পাঞ্জাবে এসে পেঁছান।

এইসময় ভারতে ছোটবড় অনেক রাজ্য ছিল। রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ কলহ অশান্তি এসব লেগেই ছিল। রাজারা একযোগে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি।

কোন কোন রাজ্যের রাজা যুদ্ধ করে হেরে যান। কোন কোন রাজা বিনা যুদ্ধে হার মেনে নেন।

তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন।

তক্ষশীলার কাছেই আর একটি বিরাট রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন পুরু।

পুরু ছিলেন যেমন বীর, তেমনি সাহসী, তেমনি যুদ্ধ নিপুণ। আলেকজাণ্ডার পুরুকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন। কিন্তু পুরু আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করলেন না।

তখন আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পুরু হেরে গেলেন। তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসা হল।

আলেকজাণ্ডার পুরুর সাহস ও বীরত্ব দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বন্দী পুরুকে তিনি বলেছিলেন—

কি আচরণ আশা কর তুমি, বন্দী ইহার পরে।

পুরু রাজা সাহসের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন—

যে আচরণ রাজার কাছে রাজা পেতে আশা করে।

পুরুর উত্তরে আলেকজাণ্ডার মোহিত হয়ে যান। তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

আলেকজাণ্ডারের মগধ জয় করার ইচ্ছা ছিল। এখনকার বিহারকে আগে মগধ বলা হত। কিন্তু গ্রীক সেনারা আর যুদ্ধ করতে রাজী ছিল না। তারা অনেকদিন ঘর-বাড়ি ছাড়া। নানাকারণে তাদের মনোবল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা দেশে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল।

মগধ জয় না করেই আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি সিন্ধুদেশ জয় করেন।

আলেকজাণ্ডার দেশে ফিরে যেতে পারেননি। পারস্যে ব্যাবিলন নামে একটা জায়গা ছিল।

ব্যাবিলনে পোঁছানোর পর আলেকজাণ্ডারের খুব জ্বর হয়। তিনি জ্বর রোগে ব্যাবিলনে মারা যান।

আলেকজাণ্ডার ভারতের ছোট বড় আঠাশটি রাজ্য জয় করেছিলেন। এই রাজ্যগুলি তাঁর সেনাপতি সেলুকাসের ভাগে পড়েছিল।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এই রাজ্যগুলি দখল করে নিয়েছিলেন। সেখানকার গ্রীকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। খবর পেয়ে সেলুকাস রাজ্যগুলি উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ হল। যুদ্ধে সেলুকাস হেরে গেলেন।

সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তর সন্ধি হল। সেলুকাস তাঁর মেয়ে হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিয়ে দিলেন।

সেলুকাস ভারত ছেড়ে চলে গেলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় তিনি একজন দূত রেখে গিয়েছিলেন। দূতের নাম মেগাস্থিনিস।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম ইণ্ডিকা।

বইটি পড়লে সে কালের ভারতবর্ষের নানা কথা জানা যায়।

গ্রীকরা সিন্ধু নদকে বলত ইন্দাস। ভারত সিন্ধুনদ বা ইন্দাসের দেশ। তাই ভারতবর্ষকে তারা বলত ইণ্ডিকা। এই ইন্ডিকা থেকে ইংরাজী ইণ্ডিয়া শব্দটির উৎপত্তি। ইংরাজীতে ইণ্ডিয়া মানে ভারতবর্ষ।

এই ইন্দাস থেকেই হিন্দু কথাটির উৎপত্তি। ইন্দাসে (ভারতে) যারা বাস করে তারা হয়ে গেল ইন্দো বা হিন্দু। হিন্দুরা যে দেশে বাস করে সে দেশের নাম হয়ে গেল হিন্দুস্থান।

বিদেশী মুসলমান শাসকরা ভারতকে বলত হিন্দুস্থান। ভারতবাসীদের বলত হিন্দু। ভারতীয়দের ধর্ম তাই হয়ে গেল হিন্দুধর্ম।

বেশ বোঝা যায় যারা ছিল আর্য পরে তারাই হয়ে গেল হিন্দু।

বৌদ্ধধর্ম জৈনধর্ম

বৈদিক যুগের শেষদিকে ধর্মে নানারকম অনাচার দেখা দেয়। যাগ-যজ্ঞ করতে অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হত। যাগ-যজ্ঞে পশুবলী দেওয়া হত। জাতিভেদ ও ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বেড়ে গিয়েছিল। সমাজে পুরোহিতদের দাপট ছিল খুব বেশী। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা সমাজের সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

সাধারণ লোক এজন্য বৈদিক ধর্মে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। জাতিভেদ প্রথা ও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তার ফলে ভারতে দুটি নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি হয়। তার একটির নাম বৌদ্ধধর্ম। অপরটির নাম জৈনধর্ম।

ভগবান বুদ্ধের কথা

নেপালের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। নেপালের তরাই এলাকায় সেকালে একটি রাজ্য ছিল। রাজ্যটির নাম কপিলাবস্তু।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা।

কপিলাবস্তুতে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাণীর নাম ছিল মায়া।

বুদ্ধদেব ছিলেন রাজা শুদ্ধোদনের ছেলে।

ছেলেবেলাতেই বুদ্ধদেবের মা মারা যান। তাঁর মাসী গৌতমী তাকে লালন-পালন করেন। তাই তার নাম রাখা হয় গৌতম।

গৌতমের আর একটি নাম ছিল সিদ্ধার্থ।



বুদ্ধদেব

ছেলেবেলা থেকেই গৌতম কেমন উদাসীন ছিলেন। নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ তার ভাল লাগত না। দুঃখীর দুঃখ দেখলে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। সবসময় চুপচাপ বসে বসে কত কি ভাবতেন।

তাঁর বয়স তখন ষোল। যশোধারা নামে রূপসী এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। বিয়ের তের বছর পরে তাঁদের একটি ছেলে হল।

ছেলের নাম রাহুল।

গৌতম বুঝলেন তিনি মায়ার বাঁধনে জড়িয়ে পড়ছেন।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। রথে চেপে তিনি রোজ শহরে ঘুরে বেড়াতেন।

বেড়াতে বেরিয়ে চারদিন তিনি চারটি দৃশ্য দেখেছিলেন :

বুড়ো থুরথুরে একজন লোক
পথ হাঁটে লাঠি ধরে ;
আর একদিন দেখলেন যাকে
অসুখ করেছে তার ;

আর একদিন মৃতদেহ দেখে
মনে জাগে হাহাকার ;
সন্ন্যাসী দেখে আর একদিন
শান্তিতে মন ভরে।

গৌতম তারপর কেবলই ভাবতেন—

মানুষ কেন বুড়ো হয় ? আহারে ! বুড়ো হলে মানুষ কত কষ্ট পায় ! কি করলে এই কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় ?

মানুষের রোগ হয় কেন ? আহারে ! রোগীর কি কষ্ট ! কি করলে রোগ ভোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় ?

মানুষ মরে কেন ? কি করলে মরণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় ?

কিন্তু সন্ন্যাসীর শান্ত মুখ দেখে তার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল।

তিনি ঠিক করলেন—তিনি সন্ন্যাসী হবেন। জরা, ব্যাধি আর মৃত্যুর কষ্টভোগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বের করবেন।

একদিন রাতে, তিনি গোপনে রাজবাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

গৌতম সন্ন্যাসী বেশে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালেন। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর শিষ্য হলেন। অনেকের মুখ থেকে অনেক উপদেশ শুনলেন। কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না। মুক্তির উপায় খুঁজে পেলেন না।

ঘুরতে ঘুরতে তিনি গয়ায় এলেন। গয়ার কাছে উরুবিল্ব নামে একটি গ্রাম ছিল। গ্রামের পাশেই নিরঞ্জনা নদী ছিল। নদীর ধারে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় বুদ্ধদেব ধ্যানে বসলেন।

ধ্যানে কতদিন, কত রাত কেটে গেল। শেষে একদিন তিনি বোধি লাভ করলেন।

বোধি মানে দিব্যজ্ঞান। বোধি বা দিব্যজ্ঞান মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্তির উপায় বলে দেয়।

বোধিলাভ করায় গৌতমের নাম হয়ে গেল বুদ্ধদেব। যেখানে তিনি সাধনা করেছিলেন সেই এলাকার নাম হয়ে গেল বোধগয়া। যে অশ্বত্থ

গাছের তলায় বসে তিনি সাধনা করেছিলেন—সেই গাছটির নাম হয়ে গেল বোধিবৃক্ষ। আর তার ধর্মমতের নাম হয়ে গেল বৌদ্ধধর্ম।

বোধিলাভ করে বুদ্ধদেব চলে গেলেন কাশীতে। কাশীর কাছেই সারনাথ। সারনাথে তিনি প্রথম ধর্মমত প্রচার করেন।

এই ঘটনার নাম ধর্মচক্র প্রবর্তন বা ধর্মচক্র চালু করা।

ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি একটি সন্ন্যাসী দল গঠন করেছিলেন। এই সন্ন্যাসীদের ভিক্ষু বলা হত।

ভিক্ষুদের থাকার জন্য তিনি সংঘ গঠন করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন দল বেঁধে কাজ না করলে কোন ফল হবে না। তাই তিনি সংঘ গঠনের উপর জোর দেন।

খুব সহজ করে, খুব সাদাসিধে ভাষায় বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত প্রচার করে বেড়াতেন। তিনি প্রাকৃত ভাষায় সকলকে উপদেশ দিতেন। সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা বলত সে ভাষার নাম প্রাকৃত ভাষা।

বেদ বেদান্ত উপনিষদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। যাগযজ্ঞের মন্ত্রগুলির ভাষাও সংস্কৃত। সাধারণ লোক সে সব মন্ত্রের মানে বুঝতে পারত না। পুরোহিতরা তা বুঝিয়েও দিতেন না।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতেন। তাদেরকে নতুন ধর্মের উপদেশ দিতেন। লোকে সে সব উপদেশ সহজে বুঝতে পারতেন। সে সব উপদেশ জটিল ছিল না।

লোকে তাই সহজেই এই নতুন ধর্মমত গ্রহণ করতে লাগল।

তখনকার অনেক রাজা মহারাজারাও এই নতুন ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন।

এই নতুন ধর্মমত যারা গ্রহণ করত তাদিকে বৌদ্ধ বলা হত।

বুদ্ধদেব প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করেন।

তাঁর স্ত্রী যশোধারা ও ছেলে রাহুল, তাঁর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন।

আশি বছর বয়সে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধদেব পরলোকে গমন করেন। এর নাম মহাপরিনির্বাণ।

বুদ্ধদেব জাতিভেদ মানতেন না। তিনি বেদের বাণী বিশ্বাস করতেন না। তিনি যাগযজ্ঞ ও পশুবলীর বিরোধী ছিলেন। তিনি ছিলেন অহিংসার পূজারী। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পুরোহিতদের মত লোভী ছিলেন না। তাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির অনেক লোক দলে দলে এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিল। বুদ্ধদেব নারীদের প্রতি খুবই উদার ছিলেন। নারীদের সবরকম কাজ করার অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়। অনেক নারী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে 'ভিক্ষুনী' হন।

বুদ্ধদেব সকলকে আটটি সহজ পথ বা নীতি মেনে চলার উপদেশ দিতেন। সেগুলি হল ঃ—

সৎ চিন্তা	সৎ সংসর্গ
সৎ বাক্য	সৎ জীবন
সৎ জ্ঞান	সৎ চেষ্টা
সৎ আচরণ	সৎ প্রতিজ্ঞা

তিনি বলতেন এই আটটি নীতি মেনে চললে মানুষের আত্মা ও মন শুচি হবে। তার মনে কোন বাসনা থাকবে না।

বাসনা না থাকায় সুখ ভোগের লোভ থাকবে না।

লোভ না থাকায় মনে হিংসা থাকবে না। মানুষ পাপের পথে পা বাড়াবে না। "লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু"।

লোভ-হিংসা না থাকায় মানুষ দুঃখ ভোগ করবে না।

এই ভাবে জীবনযাপন করলে, মরণের পর আত্মাকে আর জন্ম নিতে হবে না। এরই নাম নির্বাণ বা মুক্তি।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ভারতের বাইরে নানাদেশে এই ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুরাও অনেক পরে, বুদ্ধদেবকে ভগবানের অবতার বলে মেনে নেন। কবি জয়দেব তাঁর দশাবতার স্তোত্রে সে কথা লিখে গেছেন।

মহাবীর বর্ধমান

বর্ধমান শহরের নাম অনেকেরই জানা। শহরটির নাম আগে ছিল আস্তিক নগর। আস্তিক নগরের নাম কেন বর্ধমান হল ? সে কথাই বলি—

মহাবীর বর্ধমান, আসিলেন আস্তিক নগরে।
জৈন ধর্মের কথা, শোনালেন তিনি ঘরে ঘরে।
নতুন ধর্মের বানে ডুবু ডুবু ডুবু আস্তিক নগর।
ধর্মের তিলক পরি, বর্ধমান হল অতঃপর।

মহাবীর বর্ধমান এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। সে ধর্মের নাম জৈনধর্ম।

মহাবীর বর্ধমান অনেক দিন বর্ধমানে ছিলেন। শুধু বর্ধমান নয়, গোটা এলাকায় জৈনধর্মের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। তাঁর নামে গোটা এলাকার নাম হয়ে যায় বর্ধমান।


মহাবীর বর্ধমান

মহাবীরের আগে তেইশজন ধর্মগুরু এই নতুন ধর্মের কথা প্রচার করেন। তাঁদের তীর্থঙ্কর বলা হত। মহাবীরের আগের তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ বা পরেশনাথ।

মহাবীরও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর বাবার নাম সিদ্ধার্থ। মায়ের নাম ত্রিশলা। সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয় কুলের দলপতি ছিলেন।

মহাবীরের স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা।

ত্রিশ বছর বয়সে মহাবীর সন্ন্যাস নেন। তিনি গোসাল নামে এক সাধুর শিষ্য হন। তিনি বারবছর কঠোর তপস্যা করেন। তারপর দিব্যজ্ঞান লাভ করেন।

মহাবীর সব বিষয়ে কঠোর সংযম পালন করতেন। তাই তাকে

জিতেন্দ্রিয় বা জিন বলা হত। এই জিন থেকেই জৈন কথাটির সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবীরের ধর্মমত খুবই সহজ সরল ছিল। লোকে তাই সহজেই জৈনধর্ম গ্রহণ করে।

মহাবীর সকলকে পাঁচটি নীতি পালন করতে বলতেন। তিনি বলতেন এই নীতিগুলি পালন করলে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। নীতিগুলি হল—

অহিংসা—কাউকে হিংসা না করা। এমনকি পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ কাউকে কষ্ট না দেওয়া বা মেরে না ফেলা।

অচৌর্য—কারও জিনিস চুরি না করা।

অপরিগ্রহ—বিষয়-আশয়, টাকাকড়িতে লোভ না থাকা।

সত্য—সত্যকথা বলা ও সেইমত আচরণ করা।

ব্রহ্মচর্য—সংযত সংসার জীবন যাপন করা।

কাহাকেও ক'র না আঘাত !
ঘটায়োনা কাহারও মরণ।
অহিংসা পরম ধর্ম ;
এই নীতি করিও বরণ ॥
চুরি যেন করিও না কিছু
পরিহর লোভ তার পিছু
সদা সত্য কথা বল সবে
কর সবে সত্য আচরণ।
সব দিকে সংযমী থেকে
ব্রহ্মচর্য করহ পালন ॥

ব্রহ্মচর্য মানে, বিয়ে না করা নয়। শুদ্ধ ও সংযত জীবন যাপনও ব্রহ্মচর্য।

প্রকৃত সুখ লাভের জন্য মহাবীর ত্রিরত্ন পালনের উপদেশ দিতেন। সেগুলি হল—সৎ বিশ্বাস, সৎ-আচরণ ও সৎ জ্ঞানের অনুসরণ।

সৎ বিশ্বাস, সৎ আচরণ,
সৎ জ্ঞানের অনুসরণ—
যে করে, সে 'সিদ্ধশীল',
পুনর্জন্ম তার বারণ।

মহাবীর অনশন বা উপবাস করার উপর খুব জোর দিতেন।

মহাবীর বলতেন—সবরকম বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তাঁর নীতি ছিল 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান'। তাই তিনি নিজে কাপড় পড়তেন না। এই আচারের নাম নির্গ্রন্থ বা গ্রন্থিহীন হওয়া।

সংসারী লোকেরা এত কঠিন নিয়ম মেনে চলতে পারত না। তাই গৃহীদের জন্য অনেক সহজ নিয়ম পরে চালু করা হয়েছিল। মহাবীরের মৃত্যুর পর জৈনরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। যারা ধর্ম-নীতি পুরোপুরি মেনে চলে উলঙ্গ থাকত তাদের বলা হত দিগম্বর। যারা কাপড় পড়ত তাদের বলা হত শ্বেতাম্বর।

আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রাই বেশী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। তাদেরই মান-মর্যাদা বেশী ছিল। বৈদ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। তাদিকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের দাপট মুখ বুজে সহ্য করতে হত। জৈনধর্মে ধর্মপালনের কোন জটিলতা বা কড়াকড়ি ছিল না। বৈশ্যরা তাই দলে দলে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিল। এখনও অবাঙালী ব্যবসায়ীদের ভেতরে জৈনধর্মের লোক বেশী।

কত না বিদেশী এসেছিল দেশে

সত্যিই! কত না বিদেশী এসেছিল দেশে
বিচিত্র গঠন বিচিত্র বেশে
দেশের মাটিকে ভালবেসে সবে
এদেশে গিয়েছে থেকে;
ভারতমাতা যে আপনার করে
সবারে নিয়েছে ডেকে।

সত্যিই তাই। ভারত চিরদিনই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা। ভারতের দুয়ার চিরদিনই সকলের জন্য খোলা।

তাই এক এক সময় এক এক বিদেশী জাতি এসে ভারতের বুকে স্থান নিয়েছে।

ভারতকে আর্যভূমি বলা হয়। সেই আর্যরাও তো ছিল বিদেশী।

গ্রীকদের ভারত অভিযানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

গ্রীকদের আগে আর এক বিদেশী জাতি ভারতে এসেছিল। তারা পারসিক, মানে পারস্য দেশের লোক।

সে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগের কথা।

পারস্য সম্রাট কাইরাস গান্ধার ও কাবুল জয় করেন। দেশ দুটি তখন ভারতের ভিতরেই ছিল। কাইরাসের বংশধর দরায়ুস। তিনি রাজপুতানার মরু অঞ্চল জয় করেন। সিন্ধু অঞ্চল [এখন পাকিস্তানে] পারস্য দেশের দখলে চলে যায়।

পরে আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ জয় করেন। ভারতে পারসিক শাসনের অবসান হয়।

এবার ইন্দো গ্রীক অভিযান নিয়ে দু চার কথা বলি।

হিন্দুকুশ পাহাড়ের মাঝখানে একটি দেশ ছিল। সে দেশের নাম বাহ্লীক।

আলেকজাণ্ডারের আমলে কিছু গ্রীক সেখানে থেকে যায়। ইন্দো গ্রীকদের যবন বলা হত।

তারা পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চল দখল করে।

ইন্দো গ্রীকদের ইতিহাসে ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক বলা হয়।

মিনান্দার ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যাকট্রিয় গ্রীক রাজা।

তিনি গ্রীক আচার ত্যাগ করে ভারতীয় হয়ে যান। ভিক্ষু নাগসেনের কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি বইও লেখেন। বইটির নাম "মিলিন্দ পহ্ন"।

হেলিওডোরাস নামে একজন ব্যাক্‌টিরিয় গ্রীক বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর উপাধি ছিল পরম ভাগবত।

ব্যাকটিরিয় গ্রীকরা পরে ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে ভারতীয় হয়ে যায়।

শক নামে আর একটি বিদেশী জাতি ভারতে হানা দিয়েছিল।

তাদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার শিরদরিয়া নদীর তীরে।

ইউ-চি জাতির আক্রমণে তারা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসে। শকেরা প্রথমে কাবুলে রাজত্ব করত। পরে শকেরা ভারতের নানা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। শক রাজাদের মধ্যে রুদ্রদামন খুব বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের দমন করে শকারি উপাধি নেন।

পহ্লব বা পার্থীয়রাও শকেদের মত বিদেশী জাতি। তারাও ভারতের নানা এলাকা দখল করে শাসন চালায়। গণ্ডোফারনিস ছিলেন একজন বিখ্যাত পহ্লব রাজা। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের শকদের দমন করেন। কুষাণদের আক্রমণে ভারতে পহ্লব শাসনের অবসান হয়।

কুষাণরা ছিল ইউ-চি জাতির একটি শাখা। আগে এরা চীনের কাংসু এলাকায় বাস করত।

কুষাণরাজ কুজুল কদফিস ভারতে কুষাণ শাসনের সূচনা করেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন বলে জানা যায়।


কণিষ্ক

কুষাণ রাজাদের মধ্যে কণিষ্ক ছিলেন সবার সেরা। তিনি বছর গণনার এক নতুন রীতি চালু করেন। শকেরা সেই রীতি গ্রহণ করে। বছর গণনার সেই রীতির নাম শকাব্দ। ভারতে এখনও শকাব্দ বৎসর চালু আছে।

কণিষ্ক ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে। পুরুষপুরকে এখন পেশোয়ার বলা হয়।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মথুরায় কণিষ্কের একটি মাথা কাটা মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি পাথরের তৈরী।

বিদেশী জাতিদের ভিতরে হূণরা ছিল সবচেয়ে বর্বর ও নিষ্ঠুর। তারা মধ্য এশিয়ায় বাস করত। ভারতে এসে তারা নির্বিচারে খুন ও লুঠতরাজ করতে থাকে। ভারতের নানা অঞ্চলে তারা রাজত্ব করতে থাকে। সম্রাট দ্বিতীয় স্কন্দগুপ্ত যুদ্ধে হূণদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দেন। স্কন্দগুপ্ত মারা গেলে হূণরা আবার ভারতে অভিযান চালায়।

হূণরাজ তোরমান ও তাঁর ছেলে মিহিরকুল দুজনেই ছিলেন খুবই নিষ্ঠুর। সম্রাট নরসিংহগুপ্ত মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। তাঁকে সাহায্য করেন মালবের রাজা যশোবর্মন।

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকর বর্ধনও হূণদের দমন করেন।

হূণজাতির অনেক লোক এদেশে থেকে গিয়েছিল। পরে তারা ভারতবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। অনেকে বলেন রাজপুতরা হূণ জাতির বংশধর।

ভারতের মাটিতে সোনা ফলে। ভারতের মাটির নীচে আছে অক্ষয় ধাতুভাণ্ডার। ভারতের পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, বন-জঙ্গল সবকিছুই যেন সোনা সোনা। এইসব নানাকারণে অনেক বিদেশী জাতি বার বার ভারতে এসে হানা দিয়েছে।

কিন্তু সবাই—

এই ভারতের মাটির মায়ায়
ভারতবাসীর উদারতায়
আপন করা ভালবাসার টানে ;
তারাও হল ভারতবাসী
ইতিহাস তা জানে॥

ভারতে নানাজাতের নানা পথের নানা মতের মানুষ বাস করে। এত

গড়মিলেও তাই সকলের মনের একতারাতে সেই চিরকালের রাগিণীটি বেজে চলেছে ঃ—

পরকে নিয়েছি আপন করেগো
বিদেশী স্বদেশী ভেদ নেই।
বিভেদ ভুলিয়া ঐক্য গড়েছি
কারও মনে কোন খেদ নেই॥

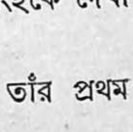
এক সন্ন্যাসী সম্রাটের কাহিনী

আমাদের জাতীয় পতাকার মাঝখানে একটি চক্র আঁকা আছে।

চক্রটির নাম অশোক চক্র। সম্রাট অশোক সারনাথে একটি স্তম্ভ তৈরী করিয়েছিলেন।

স্তম্ভের মাথায় চারটি সিংহমূর্তি দেখা যায়। সিংহগুলি পিঠে পিঠে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন দিক থেকে তিনটি সিংহকে দেখা যায়। দেখা যায়, সিংহের নীচেই এই চক্রটি আঁকা।

চক্রটি ধর্মচক্র। ভগবান বুদ্ধ ধর্মচক্র চালু করেন। তাঁর প্রথম ধর্মপ্রচারকে ধর্মচক্র বলা হয়।



সত্যমেব জয়তে

ধর্মচক্র মানে ন্যায়ের শাসন। সম্রাট অশোক ন্যায়-পথে চলতেন। ন্যায় মতে প্রজাপালন করতেন। তাই তিনি স্তম্ভের মাথায় এই চক্রটি খোদাই করিয়েছিলেন।

অশোক এই চক্র খোদাই করিয়েছিলেন বলেই চক্রটির নাম দেওয়া হয়েছে ধর্মচক্র।

মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর মায়ের নাম মুরা। মুরার সন্তান বলে তিনি নিজেকে মৌর্য বলতেন।

সেকালে ভারতে মগধ নামে বিরাট এক সাম্রাজ্য ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মগধের সম্রাট ধননন্দকে যুদ্ধে হারিয়ে মগধের সম্রাট হন।

তিনি মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল চাণক্য। চাণক্য সেকালের সেরা রাজনীতিবিদ ছিলেন। চাণক্যের লেখা অর্থশাস্ত্রে

রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি অর্থশাস্ত্রের কথা লেখা আছে। এযুগেও অনেকে সমাদর করে বইটি পড়ে থাকেন।

চন্দ্রগুপ্তের ছেলের নাম বিন্দুসার। বিন্দুসারের ছেলের নাম অশোক।

অশোক ছিলেন যেমন নির্দয় তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি অত্যাচারী। তাই তাঁকে চণ্ডাশোক বলা হত।

কিন্তু একটি ঘটনায় চণ্ডাশোক ধর্মাশোক হয়ে গেলেন।

সেই ঘটনার কথাই বলি।

মগধের পাশেই কলিঙ্গ দেশ। ওড়িশাকে আগে কলিঙ্গ বলা হত।

বিরাট সেনাদল নিয়ে অশোক কলিঙ্গ দেশ জয় করতে চললেন।

যুদ্ধে অশোক জয়ী হলেন। কিন্তু হাজার হাজার লোক যুদ্ধে মারা গেল। দেশে রক্তের ঢেউ বয়ে গেল। হাহাকারে কলিঙ্গের আকাশ বাতাস ভরে উঠল। তখন—

অনুতাপ জাগে অশোকের মনে—একি করিলাম হায়।
একি মহাপাপ করিলাম আমি, হল যে বিষম দায়॥
হু-হু করে মন মরুর মতন কোথা গেলে পাব শান্তি।
একদা তখন দিল দরশন সন্ন্যাসী সোমকান্তি॥

সেই সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু উপগুপ্ত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষু বলা হয়। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।


অশোক

অশোক উপগুপ্তর কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিলেন। উপগুপ্তর উপদেশে তিনি ধর্ম বিজয়ে মন দিলেন। তাঁর অনুচররা দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাইকে শোনাতে লাগল—ভগবান বুদ্ধের বাণী। তাঁকে সকলে ধর্মাশোক বলতে লাগল।

অশোক নিজে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করতেন। ত্যাগ ও অহিংস তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠল। তাঁর সুনাম দেশের বাইরেও ছড়িয়ে

পড়ল। সকলে বলতে লাগল—তিনি "দেবানাম পিয়"। তার মানে দেবতাদের আপনজন।

অশোক নিজের ছেলের মত প্রজাপালন করতেন। তিনি বলতেন—'সব মুনিসে পজা মম'। অর্থাৎ সব মানুষই আমার প্রজা।

প্রজাদের মঙ্গলের জন্য অশোক অনেক ভাল ভাল কাজ করেছিলেন। শুধু মানুষ নয়—পশুদের দুঃখেও তাঁর প্রাণ কাঁদত। রাজ্যে তিনি অনেক পশু চিকিৎসালয় খুলেছিলেন। স্তম্ভের গায়ে, পাহাড়ে তিনি অনেক নীতি উপদেশ খোদাই করে দিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন আগামী দিনের মানুষেরাও ঐ সব নীতি উপদেশ পড়ুক। সে সব পড়ে তারা সৎ জীবন যাপন করুক। অহিংসায় বিশ্বাসী হোক। মনে শান্তি পাক। তাই তো বলি—

অশোক রাজার নাই তুলনা ভু-ভারতের মাঝে।
সবাই তাঁকে স্মরণ করি রাত্রি দিবা সাঁঝে।
তাঁহার মতে তাঁহার পথে চলতে মোরা চাই।
অশোক চক্র জাতীয় পতাকাতে তাই॥

অশোক ছিলেন মৌর্য বংশের সেরা সম্রাট। শুধু মৌর্য বংশ নয়। সারা ভারতে, এমনকি পৃথিবীতেও তাঁর মত ধর্মপ্রাণ শাসক খুবই বিরল। ধর্মের বাঁধনে ভারত ও ভারতবাসীকে এক করেন। তিনিই ভারতের প্রথম জাতীয় সম্রাট।

কহেন কবি কালিদাস

মহাকবি কালিদাসের নাম অনেকেরই জানা। তিনি শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করেন।

শোনা যায়, ছেলেবেলায় কালিদাস মূর্খ ছিলেন। ঘটনাচক্রে এক বিদুষী রাজকুমারীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের রাতেই রাজকুমারী তা বুঝতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসকে ঘর থেকে বের করে দেন তিনি।

মনের দুঃখে কালিদাস এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে তিনি বিদ্যালাভ করলেন। অশেষ কবিগুণের অধিকারী হলেন।

সারা দেশে কালিদাসের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কালিদাসের নাম শুনলে সবাই মাথা নোয়াত। কালিদাসের নাম নিয়ে কোন কথা বললে সবাই তা মেনে নিত।

তাই কতকগুলি মেয়েলী ধাঁধাও কালিদাসের নামে চালু হয়ে গিয়েছিল। এগুলিকে এখনও কালিদাসের হেঁয়ালি বলা হয়। একটি হেঁয়ালির কথা বলছি ঃ—

চার পা থপর-থপর, দশ-পা মুখে।
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে॥

এর উত্তর একটা শিয়াল (চার পা) জলার উপর দিয়ে যাচ্ছিল (থপর-থপর)। তার মুখে একটি ক্যাঁকড়া (দশ পা) ছিল। কালিদাসের নামে এমন অনেক ধাঁধা চালু আছে।

এই কালিদাস কবেকার লোক, তা কিন্তু অনেকে জানে না। লোক কথায় বলে—তিনি ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। অনেকে গল্প কথার রাজা বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকে একই লোক বলে মনে করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্তবংশের সবচেয়ে সেরা সম্রাট। তিনি শকদের দমন করে শকারি উপাধিও নেন।

গুপ্ত বংশের আর এক সেরা সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। তিনি ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী বীর। দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্য তিনি জয় করলেন।

সমুদ্রগুপ্ত মারা গেলে তাঁর বড় ছেলে রামগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। রামগুপ্ত মারা গেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন লাভ করেন।

গুপ্ত বংশের আর একজন নামকরা সম্রাট স্কন্দগুপ্ত।

তিনি ভারত থেকে হুণদের তাড়িয়ে দেন। ইতিহাসে সে জন্য তাঁকে ভারতের রক্ষাকারী বলা হয়। সম্রাট নরসিংহগুপ্ত কুখ্যাত হুণ রাজা

মিহিরকুলকে দমন করেন। নরসিংহগুপ্ত ছিলেন সম্রাট স্কন্দগুপ্তের ভাইপো।

বাঙলা দেশের মালদহ জেলা ছিল গুপ্তদের আদিবাস ভূমি। গুপ্ত বংশের প্রথম রাজার নাম মহারাজ শ্রীগুপ্ত।

আজ থেকে প্রায় সতের শো বছর আগে ভারতে গুপ্ত রাজবংশের শাসন শুরু হয়। গুপ্ত রাজাদের শাসনকালে নানাদিকে ভারতের উন্নতি হয়েছিল। দেশের লোক সুখে-শান্তিতে বসবাস করত।

গুপ্ত যুগের পরের কথা

গুপ্ত যুগের পরে
এদেশ শাসন করে
যেসব রাজবংশ পেল
ইতিহাসে ঠাঁই,
অল্প কথায় গল্প করে
শুনিয়ে দিতে চাই।

গুপ্ত বংশের শেষ সম্রাটের নাম বুধগুপ্ত। তিনি মারা যাওয়ার পর গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। সাম্রাজ্যের নানা এলাকায় কয়েকটি নতুন রাজ্য গড়ে উঠল। সেগুলির ভিতরে মৌখরি ও পুষ্যভূতি বংশের দাপট ছিল সবচেয়ে বেশী।

মৌখরি বংশ রাজত্ব করতেন কনৌজে। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কাছাকাছি এলাকাকে, সে আমলে কনৌজ বলা হত।

কনৌজে মৌখরি বংশের গ্রহবর্মা রাজত্ব করতেন। থানেশ্বর ছিল পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধনের রাজধানী।

প্রভাকর বর্ধন হূণদের দমন করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেদের নাম রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন। মেয়ের নাম রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মার বিয়ে হয়।

তখন মালবের রাজা ছিলেন দেবগুপ্ত। আর গৌড়ের রাজার নাম ছিল শশাঙ্ক। বঙ্গদেশকে আগে গৌড় বলা হত।

দেবগুপ্ত ছিলেন মৌখরিরাজ গ্রহবর্মার শত্রু। গৌড়রাজ শশাঙ্ক ছিলেন দেবগুপ্তের বন্ধু।

প্রভাকর বর্ধন মারা গেলেন। তাঁর বড় ছেলে রাজ্যবর্ধন হলেন থানেশ্বরের রাজা।

দেবগুপ্ত ও শশাঙ্ক একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবর্মা পরাজিত ও নিহত হলেন। রানী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হলেন।

খবর পেয়ে রাজ্যবর্ধন ছুটলেন বোনকে উদ্ধার করতে। বিরাট সেনাদল নিয়ে কনৌজের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। গৌড়রাজ শশাঙ্ক তাঁকে বাধা দিলেন। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হল।

তখন হর্ষবর্ধন হলেন থানেশ্বরের রাজা। রাজা হয়েই প্রথমে তিনি রাজ্যশ্রীকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

যুদ্ধে তিনি কনৌজ জয় করলেন। কিন্তু কোথায় রাজ্যশ্রী! রাজ্যশ্রী সুযোগ বুঝে কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

হর্ষবর্ধন হতাশ হলেন। রাজ্যশ্রীকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন তিনি। রাজ্যের মায়া ছেড়ে দিয়ে বোনের খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়েছিলেন। বিন্ধ্য পাহাড়ের জঙ্গলে তখন তার দিন কাটে না, রাত কাটে না। তার মন থেকে জীবনের সব রঙ মুছে গেছে। তিনি তখন দিন রাত ভাবছেন:

কোথা রাজ্য, কোথা শ্রী, বৃথা মোর রাজ্যশ্রী নাম
পিতৃ গৃহে কত সুখে, কুমারী জীবন কাটালাম।
দেবতুল্য বীর স্বামী, ভাগ্যদোষে হারাইনু তারে,
বন্দিনী করিয়া মোরে রেখে দিল অন্ধ কারাগারে।
মোর লাগি প্রাণ দিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্কের হাতে;
উদ্ধার করিতে মোরে, হর্ষ আসে সেনাদল সাথে।
কারাগার হতে শেষে পলাইনু পাইয়া সুযোগ;
রাজকন্যা রাজবধূ কে সহেছে এ হেন দুর্ভোগ।
সহে না সহে না আর এ জীবনে দৈবের পীড়ন
নিজ হাতে চিতা জ্বালি এ জীবন দিব বিসর্জন।

বনের মাঝে কাঠ-পাতা জড় করে চিতা সাজালেন রাজ্যশ্রী। চোখে তার একবিন্দু জল নেই। দুঃখের উত্তাপে শুকিয়ে গেছে চোখের জল।

আগুন জ্বালিয়ে চিতায় আগুন দিলেন রাজ্যশ্রী। দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল। চিতার আগুনে ঝাঁপ দিতে যাবেন এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছে রাজ্যশ্রী! রাজ্যশ্রী!

মুখ ফিরিয়ে দেখলেন—তাঁর প্রিয় ভাই হর্ষবর্ধন পাগলের মত ছুটে আসছে সেদিকে। রাজ্যশ্রী ভাইয়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাঁদতে লাগলেন অঝোর ধারায়।

রাজ্যশ্রীকে নিয়ে কনৌজে ফিরে এলেন হর্ষবর্ধন। থানেশ্বরের বদলে কনৌজ হল তাঁর রাজধানী। মহারাজ উপাধি ধারণ করে তিনি কনৌজের সিংহাসনে বসলেন। হর্ষ ছিলেন বীর, সাহসী এবং রণনিপুণ। তিনি গৌড় দেশ দখল করেন। তাঁকে 'সকলোত্তর পথ নাথ' বা সারা উত্তর ভারতের অধিপতি বলা হত। হিউয়েন সাঙ নামে এক চীনদেশের পণ্ডিত, হর্ষবর্ধনের সভায় ছিলেন। তাঁর বিবরণে হর্ষকে পঞ্চ ভারতের অধিপতি বলা হয়েছে। এই পঞ্চ ভারত হল পাঞ্জাব, কনৌজ, বঙ্গ, দ্বারভাঙ্গা (বিহার) ও উৎকল বা উড়িষ্যা।



হর্ষবর্ধন

হর্ষ ছিলেন সুশাসক। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও সুলেখক। তিনি কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন। কবি বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকবি। বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে একটি বই লেখেন।

হর্ষ প্রথমে শিবের উপাসক ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন।

হর্ষবর্ধন প্রয়াগে পাঁচ বছর পরপর দানমেলা বসাতেন। পঁচাত্তর দিন ধরে মেলা চলত। মেলায় যে যা চাইত তাকে তা' দান করতেন।

একবার হয়েছে কি—যা কিছু ছিল সব দান করে দিয়েছেন। এমন সময় এক সাধু এসে হাজির। হর্ষবর্ধন কি আর করবেন। রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে আনলেন। সেই কাপড়টি তিনি পরলেন। আর রাজবেশ খুলে দান করে দিলেন সেই সাধুকে।

ভোজবাজির মিহিরভোজ

যাদুবিদ্যাকে ভোজবাজি বলে। হঠাৎ কিছু খুঁজে না পেলে অনেকে বলে—এইতো এখানে ছিল। গেল কোথায়! এ কি ভোজবাজি নাকি!

ভোজবাজি নাম কেন হল? সে গল্প বেশ মজার।

হর্ষবর্ধনের পর কনৌজের সিংহাসনে বসেন যশোবর্মন। তিনি ছিলেন মৌখরি বংশের লোক। তারপর প্রতিহার বংশের রাজারা কনৌজে রাজত্ব করতেন।

প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম মিহিরভোজ। সে আজ থেকে এগারশো বাহান্ন বছর আগের কথা।

এই মিহিরভোজ ছিলেন বীর, সাহসী ও রণনীতিতে বিশেষ নিপুণ। তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। গৌড় বা বঙ্গদেশের বিরাট এলাকা তিনি দখল করেছিলেন। রাজপুতানা, মালব, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ তিনি জয় করে নেন। তাঁর আমলে আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। যুদ্ধে তিনি আরবদের হারিয়ে দেন।

রাজা মিহিরভোজ অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সভায় মেগাস্থিনিস বা বানভট্টের মত কোন লেখক ছিল না। তাই তাঁর জীবন ও রাজত্বের খুঁটিনাটি বিবরণ জানা যায় না। কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে মহারাজ মিহিরভোজ আজও অমর হয়ে আছেন। দেশের ভিখারীদের মুখে ভোজবাজির কথা শোনা যায়। কিন্তু তারা জানে না—কে এই ভোজ? কোথাকার রাজা ছিলেন তিনি?

মহারাজ ভোজ ছিলেন একজন রাজা যাদুকর; যাদুকর রাজা।

যাদুবিদ্যা তিনি ভাল জানতেন। খবর যোগার করার জন্য তিনি বিরাট গুপ্তচর বাহিনী গঠন করেন। তাদের তিনি যাদুবিদ্যা শেখান। গুপ্তচররা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরত। যাদুর খেলা দেখিয়ে তারা প্রজাদের বশীভূত করত। কোন কাজ করার সময় গুরুর নাম নেওয়াই রীতি। তারা তাই ভোজের নাম নিয়ে যাদুর খেলা দেখাত। যাদুর খেলার আর এক নাম বাজি। যাদুবিদ্যাকে তাই ভোজবাজি বলে।

যাদুবিদ্যা বা ভোজবাজির গুণে প্রতিহাররাজ মিহিরভোজ দেশবাসীর কাছে আজও অমর হয়ে আছেন।

প্রথম বাঙালী সম্রাট

শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়ের সামন্ত রাজা। সে আমলে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু এলাকাকে গৌড় বলত।

সে আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগের কথা। গুপ্ত সাম্রাজ্য তখন ভাঙনের মুখে। সেই সুযোগে শশাঙ্ক গৌড়ে স্বাধীন রাজ্যগঠন করলেন। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ।

মুর্শিদাবাদ জেলায় চিরুটি নামে একটি রেল-স্টেশন আছে। চিরুটির কিছুদূরে যদুপুর গ্রাম। তখন যদুপুরের নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ।

শশাঙ্ক ছিলেন মহাবীর। যুদ্ধে তিনি থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনকে পরাজিত ও নিহত করেন। হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও শশাঙ্কের ঘোর যুদ্ধ হয়। হর্ষবর্ধন শতচেষ্টা করেও গৌড় দখল করতে পারেননি।

শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা জয় করেন। দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ জয় করে নেন। এভাবে নানা রাজ্য জয় করে তিনি গৌড় সাম্রাজ্য গঠন করেন। বঙ্গদেশের বাইরে সেই প্রথম বাঙালীর সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। উত্তর ভারতে শশাঙ্কই প্রথমে বাঙালীর গৌরব গাথা ছড়িয়ে দেন।

শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী। বৌদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ শশাঙ্কের আদেশে কেটে ফেলা হয়েছিল।

শশাঙ্কের কৃতিত্বের কোন খুঁটিনাটি বিবরণ জানা যায় না। তাঁর সাম্রাজ্যে বা সভায় তেমন কোন লেখক বা কবি বোধহয় ছিলেন না। শশাঙ্কের আমলে হিঙয়েন সাঙ এদেশে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উঁচুদরের পণ্ডিত ও লেখক। তিনি মহারাজ হর্ষবর্ধনের সভায় ছিলেন। হর্ষবর্ধন সম্পর্কে অনেক কথা তিনি লিখে গেছেন। কিন্তু শশাঙ্কের কথা তেমন কিছু লেখেননি।

নির্বাচিত গৌড়রাজ গোপাল

মহারাজ শশাঙ্ক মারা গেলেন। গৌড় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। গৌড়ে অশান্তি ও অরাজকতা শুরু হল। গৌড়ের নানা এলাকায় নানা রাজবংশ ছোট ছোট রাজবংশ গড়ে তুলল। কোথাও-বা ভদ্রবংশ, কোথাও-বা খড়্গবংশ রাজত্ব করতে লাগল। এক রাজার সঙ্গে আর এক রাজার কেবলই যুদ্ধ হত।

রাজ্যেও শান্তি বলতে কিছু ছিল না। বেশীর ভাগ রাজাই ছিলেন ভীরু, দুর্বল, কাপুরুষ। তাঁদের বিচার-শক্তি বলতে কিছুই ছিল না।

ফলে যা হওয়ার কথা, ঠিক সেটাই ঘটেছিল। রাজার হুকুম কেউ মানত না। সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত। দুর্বল বিচার চেয়েও সুবিচার পেত না।

পুকুরে দেখি বড় মাছ ছোট মাছকে গিলে খেয়ে ফেলছে। সেইরকম ছোট মাছ, তার চেয়ে ছোটমাছকে গিলে খাচ্ছে। গৌড়ে তখন ঠিক এই অবস্থা। যে প্রবল, সে দুর্বলকে পীড়ন করত। দুর্বল আরও দুর্বলকে পীড়ন করত। সমাজের এই অবস্থাকে নীতি-শাস্ত্রে মাৎস-ন্যায় বলা হয়। তখনকার পণ্ডিতেরা সমাজের এই অবস্থাকে মাৎস-ন্যায় নাম দিয়েছিলেন। সকলেই এ অবস্থাকে যেন নিয়ম বলে মেনে নিয়েছিল।

তা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। গৌড়ের বাইরে এই সামাজিক নীতিকে গৌড়তন্ত্র বলা হত। গৌড়তন্ত্র ঠিক যেন—

যারই লাঠি, তারই মাটি,
এই কথাটি জেনে খাঁটি
তোমার চেয়ে কমজোরী যে
সবকিছু তার লুঠ করে নাও।
জোর বেশী যার তোমার চেয়ে
করবে সে লুঠ তোমার টাও॥

গৌড়ে প্রায় একশ বছর ধরে এরকম অরাজকতা চলেছিল। ফলে দেশের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ লোকের দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না। শেষে ঘা খেয়ে খেয়ে দেশের লোকের চেতনা ফিরল। সবাই বুঝতে পারল দেশে একজন বীর ও সাহসী রাজা থাকা দরকার। তিনি হবেন সুশাসক ও সুবিচারক। একজন ভাল রাজনীতিবিদ। তবেই এই অরাজকতা দূর করা যাবে।

সমাজপতিরা তখন একে অপরের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা শুরু করে দিলেন। কাকে গৌড়ের রাজা করা যায়? কে রাজা হলে, দেশে শান্তি ফিরে আসবে? লোকে সুবিচার পাবে? সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে না। অত্যাচারী কঠোর শাস্তি পাবে?

সমাজপতিরা সে বিষয়ে সাধারণ লোকের মতামতও নিয়েছিলেন। সকলের বিবেচনায় গোপাল নামে একজনকে গৌড়দেশের রাজা মনোনীত করা হল।

গোপাল ছিলেন পাল বংশের একজন সামন্ত রাজা। তিনি ছিলেন বীর, বুদ্ধিমান, সাহসী ও বিচক্ষণ। একজন আদর্শ নেতার সব গুণই তাঁর ভেতরে ছিল।

গোপাল রাজা হয়ে গৌড় বাংলায় শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। দেশে মাৎস-ন্যায়ের অবসান ঘটল। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার বন্ধ হল। তাঁর সুশাসনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতে লাগল।

ইতিহাসে পাল বংশের সুনাম আছে। গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশ বাঙলাদেশে প্রায় সাড়ে চারশ বছর রাজত্ব করে।

গোপাল রাজা হওয়ায় গৌড় বাঙলায় এক নতুন যুগ এল। পাল রাজাদের আমলে বাঙলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মের খুবই উন্নতি হয়। এ যুগে বাঙালীর মুখের ভাষায় সাহিত্যরচনা শুরু হয়। তার আগে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বই লেখা হত। এই সময়েই সহজিয়া বৌদ্ধরা অনেক চর্যাপদ বা দোহা রচনা করেন। চর্যাপদগুলি কবিতায় লেখা। বাঙলা ভাষা তখন সবে প্রাকৃত ভাষা থেকে খোলস ছেড়ে বেরুতে শুরু করেছে। একটি চর্যাপদের দুটি ছত্র এখানে তুলে দেওয়া গেল। তা পড়লেই বাঙলা ভাষার আদি রূপের পরিচয় পাওয়া যাবে ঃ—

সোনে ভরতি করুণা নাবি।
রূপা যাঠাঁই, নাহি থোবি ॥

ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি গোপালের ছেলে।

ধর্মপাল বীর ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। বাহুবলে গৌড় রাজ্যকে তিনি শক্তিশালী করে তোলেন। নানা দেশ জয় করে তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। ইতিহাসে ধর্মপালের রাজ্যকালকে "বাঙালী জীবনের সুপ্রভাত'' বলা হয়েছে। তিনি "পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ''—এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বিক্রমশীলা ও সোমপুর বৌদ্ধ বিহার গঠিত হয়। এই দুটি বিহারে হাজার হাজার ছাত্র পড়াশোনা করত।

ধর্মপালের ছেলের নাম দেবপাল। দেবপালও নানা দেশ জয় করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের একটি দ্রাবিড় রাজ্য জয় করে নেন। তাঁর আমলে নালন্দায় বৌদ্ধ বিহার গঠিত হয়।

পাল বংশের আর এক রাজার নাম মহীপাল। মহীপাল খুব জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। লোকে এখনও বলে—"ধান ভানতে মহীপালের গীত।''

পাল বংশের দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন একজন অত্যাচারী শাসক। তাঁর অত্যাচারে প্রজারা বিরূপ হয়ে ওঠে। দিব্যোক নামে একজন কৈবত,

নায়ক সিংহাসন দখল করেন। পাল বংশের রামপালের সঙ্গে দিব্যোকের ভাইপো ভীমের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীমপালকে নিহত করে রামপাল সিংহাসন দখল করেন।

রামপালের সভাকবির নাম সন্ধ্যাকর নন্দী। তিনি রামচরিত নামে একটি বই লেখেন। ঐ বইটিতে রামপালের বীরত্ব ও গুণাবলীর কথা লেখা আছে।

সেন বংশের কাহিনী

পাল বংশের পতনের পর গৌড়বঙ্গে সেন বংশের রাজত্ব শুরু হয়। সেন রাজারা হিন্দু ছিলেন। পাল যুগে দেশের অনেক লোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ ছিল না। সেনযুগে জাতিভেদ প্রথা নিয়ে বেশ কড়াকড়ি শুরু হয়। রাজা বল্লালসেন খুব বিদ্বান ছিলেন। জাতিভেদ প্রথাকে মজবুত করার জন্য তিনি একটি নতুন প্রথা চালু করেছিলেন। তিনি সমাজে বাহ্মণ (বামুন), কায়স্থ (কায়েত) ও বৈদ্যদের (বৈদ্যি) সমাজের সবচাইতে উঁচু আসন দিয়েছিলেন। এই তিনটি জাতির ভেতরে তিনি আবার উঁচু-নীচু ভেদ সৃষ্টি করেছিলেন। যাঁরা লেখাপড়া জানতেন, যাঁরা নিয়মমত ধর্মকর্ম পালন করতেন, যাঁরা নিয়মিত তীর্থে যেতেন তাঁদের তিনি কুলীন আখ্যা দিলেন। যাঁরা কুলীন আখ্যা পেলেন না, তাদের বংশজ বা মৌলিক বলা হত। এই প্রথার নাম কৌলীন্য প্রথা। বংশজ বা মৌলিকেরা কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারত। তার জন্য অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হত। কিন্তু বংশজ বা মৌলিক পাত্রের সঙ্গে কুলীন মেয়ের বিয়ে দিলে, মেয়ের বাবার কুলভেঙ্গে যেত। কুলীন বংশে মেয়ের বিয়ে দিলে কুলের মর্যাদা বাড়ত। এজন্য একজন কুলীন পাত্রের সঙ্গে অনেক মেয়ের বিয়ে হত। এর নাম বহুবিবাহ প্রথা। একজন কুলীন বামুন আশি-নব্বইটি বিয়ে করত এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে। কুলমর্যাদা বজায় রাখার জন্য আট-দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে সত্তর-আশি বছরের বুড়ো লোকের বিয়ে হত। ফলে উচ্চ বর্ণের হিন্দু সংসারে বাল্যবিধবার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ছাড়া সমাজের অন্য জাতের লোকেদের নবশাখ শূদ্র বলা হত। বাকী সবাইকে অনুন্নত হিন্দু পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল।

হিন্দুধর্মকে মজবুত করতে গিয়ে ধর্মে অনাচার প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। গৌরীদানের নামে ছেলেবেলাতেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। না দিলে, মেয়ের বাবাকে সমাজে একঘরে করে রাখা হত। স্বামী মারা গেল, স্ত্রীকে একই চিতায় পুড়িয়ে ফেলা হত। এরই নাম সতীদাহ।

অনুন্নত হিন্দুরা সমাজে ঘৃণার পাত্র ছিল। তাদের ছায়া স্পর্শ করলে স্নান করতে হত। উচ্চ জাতের দেব মন্দিরে তারা ঢুকতে পারত না, পূজা দিতে পারত না। কেউ তাদের ছোঁওয়া জল খেত না। সমাজে তাদের পরিচয় ছিল—তারা জল অচল জাত। তারা খুবই দীন হীন জীবন যাপন করত। তাদের লেখাপড়ার শেখার কোনও সুযোগ ছিল না।

জাতিভেদের কুফল ফলতে খুব বেশী দেরী হল না। সমাজের নীচু থাকের লোকেরা দেশ সম্বন্ধে খুবই উদাসীন হয়ে পড়েছিল। দেশের প্রতি তাদের কোন মমতা ছিল না। ফলে মুসলমান অভিযানের সময়, তারা একেবারে চুপচাপ ছিল। মুসলমান অভিযানকারীরা তাই সহজেই বঙ্গদেশ জয় করে নিতে পেরেছিল।

লক্ষ্মণসেনের আমলে বঙ্গদেশে মুসলমান অভিযান শুরু হয়। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী নামে এক পাঠান সেনাপতি রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন গোপনে নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যান। সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে আরও কিছুকাল রাজত্ব করেন।

গোঁড়া হিন্দুয়ানী ও কৌলিন্য প্রথার জন্য সেন আমলে সমাজের নৈতিক পতন ঘটেছিল। দেশের অভিজাত ও উঁচু জাতের লোকেরা বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের বাধা দেওয়ার মত শক্তি ও মনোবল তাদের ছিল না। অনুন্নত হিন্দুরা মুসলমানদের বাধা দানে এগিয়ে আসেনি। জাতপাতের ফাঁস থেকে তারা মুক্তি চাইছিল। তাই মুসলমান শাসন কায়েম হওয়ার পর তারা দলে দলে ইসলামধর্ম গ্রহণ

করে। ইসলামধর্মে জাতিভেদ নেই। সকলের একসঙ্গে উপাসনার অধিকার আছে। অবহেলিত অনুন্নত হিন্দুরা তাই সহজেই এই নব ধর্মকে গ্রহণ করতে উৎসাহী হয়ে পড়ে।

সেন যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির খুব উন্নতি হয়। লক্ষ্মণসেনের এক সভাকবির নাম জয়দেব। বীরভূম জেলার কেন্দুলি তাঁর জন্মভূমি। সেখানে আজও পৌষ-সংক্রান্তির দিনে বিরাট মেলা বসে। জয়দেব গীত-গোবিন্দ নামে একটি মধুর কাব্য রচনা করেন। এ যুগে গৌড়বঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও বেশ উন্নতি হয়। ভারতের বাইরের দেশগুলির সঙ্গেও বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। হুগলীর (তখন হুগলী নাম হয়নি) সরস্বতী নদী তখন বেশ চওড়া ও গভীর ছিল। এই নদীর তীরে সপ্তগাম বা সাঁতগা সেকালের একটি নামকরা বন্দর ছিল। এই বন্দরে দেশ-বিদেশের নৌকা জাহাজ এসে ভিড় জমাত। কিন্তু তাহলে কি হবে। জাতপাতের গোঁড়ামির জন্য সমাজে ভাঙ্গন ধরে। চরিত্রের অবনতি ঘটে। ফলে মুসলমানেরা সহজেই এ দেশ জয় করে নেয়।

এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল

কবি বলেছেন, "এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল"। পাঠানেরা ছিল আফগানিস্থানের বাসিন্দা। তখন আফগানিস্থানের ভিতরে ছিল পাখ্‌তুনিস্থান। পাখ্‌তুনিস্থানের লোকেদের বলা হত পাঠান। পাঠানেরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।

ইসলামধর্মের প্রবর্তকের নাম হজরত মহম্মদ। তিনি ছিলেন আরব দেশের লোক। হর্ষবর্ধন তখন কনৌজের রাজা। হজরত মহম্মদ সেই সময় আরব দেশে এক নতুন ধর্মমত চালু করেন। সেই ধর্মের নাম—ইসলামধর্ম। ইসলাম যাদের ধর্ম, তারাই মুসলমান।

হজরত মহম্মদ মারা যাওয়ার পর আরবের মুসলমানেরা দেশজয়ে বেড়িয়ে পড়ে। পারস্য, তুর্কীস্থান এসব দেশে মুসলমান শাসন কায়েম হয়। সেখানকার লোকজন মুসলমান হয়ে যায়।

আজ থেকে এক হাজার দু'শো পঁচাত্তর বছর আগের কথা। আরবের মুসলমানরা সিন্ধুদেশ জয় করে।

তখন থেকেই ভারতে মুসলমান অভিযান শুরু হয়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান। তুর্কীরা আফগানিস্থান জয় করে। আফগানিস্থানে গজনী নামে এক রাজ্য ছিল। গজনীর রাজা বা সুলতানের নাম ছিল মামুদ।

সুলতান মামুদ নয়শো-অষ্টাশী বছর আগে প্রথম ভারত অভিযান করেন। মামুদ মোটমাট সতেরবার ভারত অভিযান করেছিলেন।

মামুদের ভারতে রাজত্ব করার ইচ্ছা ছিল না। তার ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি ঃ (১) ধনরত্ন লুঠ করা (২) ভারতবাসীদের মুসলমান করা।

সুলতান মামুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুঠ করেন। সোমনাথ শিব মন্দির ছিল দেখার মত। মন্দিরের ভিতরে শিবলিঙ্গটি শূন্যে ঝোলান থাকত। অর্থাৎ মাটিতে ছুঁয়ে বা ছাদে ঠেকে থাকত না। মন্দিরে প্রচুর ধনরত্ন ছিল।

সোমনাথ ছিল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দু রাজারা প্রাণপণ চেষ্টা করেও মন্দির রক্ষা করতে পারেননি। সুলতান মামুদ শিবলিঙ্গটি ধ্বংস করেন। মন্দির থেকে তিনি দু'কোটি সোনার টাকা ও অনেক হীরা, মুক্তা, মণি-মাণিক্য লুঠ করেন।

গজনী ও হিরাটের মাঝামাঝি ঘোর নামে একটি রাজ্য ছিল।

গিয়াসউদ্দীন ঘোরী ছিলেন ঘোর রাজ্যের সুলতান। তার ভাইয়ের নাম মহম্মদ ঘোরী।

মহম্মদ ঘোরী গজনী অধিকার করেন। তারপর ভারত অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

সে সময় চালুক্যরাজ ভীম ছিলেন গুজরাটের অধিপতি। যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী হেরে পালিয়ে যান। পরের বছর পাঞ্জাব দখল করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যান।

পৃথ্বীরাজ চৌহান তখন দিল্লীর রাজা। তিনি রাজপুত রাজাদের নিয়ে জোট বাঁধেন। তরাইনে তিনি মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত ও আহত করেন। মহম্মদ ঘোরীকে পালাবার সুযোগ দেন।

পৃথ্বীরাজ ইচ্ছা করলে মহম্মদ ঘোরীর সেনাদলকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারতেন। তাকে বন্দী করতে পারতেন। কিন্তু অহমিকা ও উদারতার জন্য তা করেননি। না করে তিনি ভুল করেছিলেন।

পরের বছর ঘোরী বিরাট সৈন্যদল নিয়ে আবার ফিরে এলেন। তরাইনের মাঠে দু'দলের ঘোর যুদ্ধ হল। যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ হেরে যান। তাঁকে বন্দী ও নিহত করা হয়।

ঠিক দু' বছর পরে মহম্মদ ঘোরী কনৌজ দখল করেন। তখন কনৌজের রাজা ছিলেন জয়পাল।

জয়পালের মেয়ের নাম সংযুক্তা। রাজকুমারী সংযুক্তার ছিল যেমন রূপ তেমনি গুণ।

মেয়ের বিয়ের জন্য জয়পাল স্বয়ংবর সভা ডেকেছিলেন। নানা দেশের রাজা-মহারাজাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শুধু পৃথ্বীরাজ বাদ পড়েছিলেন।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে জয়পালের বিরোধ ছিল। জয়পাল তাই পৃথ্বীরাজকে নিমন্ত্রণ করেননি। শুধু তাই নয়। তিনি পৃথ্বীরাজের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়েছিলেন। প্রতিমূর্তিটিকে স্বয়ংবর সভায় দরজার সামনে রেখে দিয়েছিলেন। চরমুখে পৃথ্বীরাজ সে খবর পেয়েছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে স্বয়ংবর সভায় লুকিয়েছিলেন।

স্বয়ংবর সভায় সংযুক্তা কারও গলায় মালা দিলেন না। এগিয়ে গেলেন পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্তির দিকে। প্রতিমূর্তির গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা।

সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন। তাঁর লোকজন ছদ্মবেশে বাইরে অপেক্ষা করছিল। ঘোড়াও তৈরী ছিল। ঘোড়ার পিঠে সংযুক্তাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন কনৌজ ছেড়ে।

জয়চাঁদের সৈন্যদল তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করেছিল। কিন্তু ধরতে পারেনি পৃথ্বীরাজকে।

এ ঘটনায় জয়চাঁদের খুব অপমান হয়। অপমানের শোধ নিতে তিনি মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করেন।

জয়চাঁদ ভেবেছিলেন মহম্মদ ঘোরী সুলতান মামুদের মত লুঠেরা। ধনরত্ন লুঠ করে ফিরে যাবেন ঘোর রাজ্যে। পরে তিনিই হবেন দিল্লীর রাজা।

কিন্তু তা হল না। মহম্মদ ঘোরী কনৌজ দখল করলেন। জয়চাঁদকে নিহত করলেন।

পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদ একজোট হয়ে যুদ্ধ করলে মহম্মদ ঘোরী কিছুতেই দিল্লীর সিংহাসন দখল করতে পারত না।

মহম্মদ ঘোরী রাজ্যজয় ও লুঠপাট করে ফিরে গেলেন আপন রাজ্যে। ভারতের শাসনভার দিয়ে গেলেন তাঁর সেনাপতি কুতবউদ্দিন আইবেককে।

কুতবউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। ভারতে পাঠান মুসলমানদের শাসনের ভিত পাকা হল।

পাঠান শাসকরা ভারতে তিনশো বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন।

কুতবউদ্দিনের এক সেনাপতির নাম বখ্‌তিয়ারবিন খল্‌জী। বখতিয়ার খল্‌জী গৌড়বঙ্গে মুসলমান শাসন কায়েম করে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কয়েকটি পাঠান রাজবংশ

কুতবুদ্দিন ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। তাই কুতবুদ্দিনের বংশকে দাসবংশ বলা হয়। দাসবংশের পর ভারতে খল্‌জী বংশের শাসন শুরু হয়।

দাসবংশের সুলতানেরা ছিলেন তুর্কীস্তানের মুসলমান। খল্‌জী বংশের প্রথম সুলতান জালালুদ্দিন খল্‌জী ছিলেন হিন্দুস্তানী মুসলমান। অর্থাৎ তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতের লোক ছিলেন।

খল্‌জীবংশের পর ভারতে তুঘ্‌লক বংশের শাসন শুরু হয়। তারপর সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের শাসন শুরু হয়। পাঠান শাসকদের সুলতান বলা হত। ভারতের পাঠান শাসনের কালকে তাই সুলতানী আমল বলা হয়ে থাকে।

লোদীবংশের শেষ সুলতানের নাম ইব্রাহিম লোদী। এই সময়ে লোদীবংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে মধ্যএশিয়ার ফারাগানার অধিপতি বাবর দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নেন। বাবর চাঘতাই তুর্কীবংশের লোক। তাঁর মা ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর বংশধর ইউনুস খাঁর মেয়ে। বাবরের বংশকে তাই মোগল বা মুঘল বংশ বলা হয়। তিনি ভারতে মুঘল বা মোগল শাসনের সূচনা করেন।

পাঠান আমলে বিদেশী অভিযান

পাঠান আমলে তিনজন দুর্ধর্ষ বীর বিরাট সেনাদল নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন।

দাসবংশের ইলতুৎমিস তখন দিল্লীর সুলতান। সেই সময় দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বীর চেঙ্গিস খান ভারতে প্রবেশ করেন।

মধ্য এশিয়ায় বিভা রাজ্যের সুলতান ছিলেন খারাজাম শাহ। চেঙ্গিস খার আক্রমণে তিনি রাজ্য ছেড়ে পালান। খারাজাম শাহ সদলবলে পাঞ্জাবে ঢুকে পড়েন। তাঁর পিছু নিয়ে চেঙ্গিস খাঁও পাঞ্জাবে চলে আসেন।

চেঙ্গিস খাঁর ভয়ে ইল্‌তুৎমিস খারাজাম শাহকে সাহায্য করেননি। তাই খারাজাম শাহ ভারত ছেড়ে চলে যান। সঙ্গে সঙ্গে চেঙ্গিস খানও ভারত ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর সেনাদলের অত্যাচার ও লুণ্ঠনে সাধারণ মানুষের অনেক ক্ষতি হয়।

সুলতান জালালুদ্দিনের আমলে, মোঙ্গলবীর হুলাগু ভারত আক্রমণ করে। যুদ্ধে জালালুদ্দিন জয়ী হন। অনেক বন্দী মোঙ্গল ইসলাম-ধর্মগ্রহণ করে। তাদের নাম হয় নব মুসলমান। জালালুদ্দিনের

অনুমতি নিয়ে তারা দিল্লীর কাছাকাছি এলাকায় বাস করতে থাকে। আর এক দুর্ধর্ষ লুঠেরা দিগ্বিজয়ী বীরের নাম তৈমুরলঙ্গ। তিনি ছিলেন চাঘতাই তুর্কী বংশের লোক। তাঁর এক পা খোঁড়া ছিল। তাই লোকে তাকে 'লঙ্গ' বলত।

তৈমুরলঙ্গ সমরখন্দের শাসক ছিলেন। তিনি পারস্য, আফগানিস্থান ও মেসোপটেমিয়া জয় করেন। বাষট্টি বছর বয়সে তিনি বিরাট সেনাদল নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন।

সুলতান মামুদশাহ তখন দিল্লীর শাসক। তিনি ছিলেন তুঘলক বংশের সুলতান।

মামুদশাহ যুদ্ধে হেরে গিয়ে দিল্লী থেকে পালান। তৈমুরলঙ্গ একলক্ষ হিন্দুকে নিহত করে দিল্লীতে প্রবেশ করেন।

তৈমুরলঙ্গ চারদিন দিল্লীতে থাকেন। তার সেনাদল এই চারদিনে দিল্লীর অধিবাসীদের অবাধে হত্যা করে। প্রচুর ধনরত্ন লুঠ করে তৈমুর দেশে ফিরে যান। তৈমুরের আক্রমণে দিল্লী শ্মশানে পরিণত হয়।

মেয়ে সুলতান রাজিয়া

আজ থেকে সাতশো বছর আগের কথা। শুনতে অবাক লাগে একজন মহিলা সে সময় দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন। তাঁর নাম সুলতান রাজিয়া।

সুলতান রাজিয়াই ভারতের প্রথম মহিলা শাসক। তিনি ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিসের মেয়ে। ইলতুৎমিস তাঁকেই দিল্লীর সুলতান হিসেবে মনোনীত করে যান।

কিন্তু তুর্কী আমীরদের সে ব্যবস্থা পছন্দ হল না। তাই তাঁরা ইলতুৎমিসের ছেলে রুকনুদ্দিনকে সিংহাসনে বসালেন।

রুকনুদ্দিন ছিলেন অপদার্থ, কুশাসক ; সুলতান হওয়ার অযোগ্য। তাঁর কুশাসনে প্রজারা অস্থির হয়ে উঠল। তারা চাইল রাজিয়াই দিল্লীর সুলতান হন।

সেই সুযোগে রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন।

রাজিয়া অশেষ গুণবতী মহিলা ছিলেন। তিনি যুদ্ধ-বিদ্যা জানতেন। ঘোড়ায় চাপতে পারতেন। তাঁর অনেক পুরুষোচিত গুণ ছিল। তাঁর সুশাসনে প্রজারা খুসী হয়। রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু তুর্কী আমীররা মহিলা সুলতানের অধীনতা সইতে পারলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী হলেন।


রাজিয়া

বাহরামশাহ নামে ইলতুৎমিসের আর একটি ছেলে ছিল। আমীররা রাজিয়ার বদলে বাহরামশাহকে দিল্লীর সিংহাসনে বসালেন। বাহরামশাহের আদেশে রাজিয়া নিহত হলেন।

রাজিয়া ছিলেন সুশাসিকা। মহিলা হওয়ার অপরাধে (!) তাঁকে শত্রুর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

শ্বশুর ঘাতক সুলতান

জালালুদ্দিন খল্‌জীর ভাইপো আলাউদ্দিন খল্‌জী। জালালুদ্দিন খলজী ভাইপোকে খুব ভালবাসতেন। নিজের মেয়ের সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিয়ে দেন। আলাউদ্দিন-এ ভালবাসার দাম দেননি। সিংহাসনের লোভে তিনি আপন কাকা এবং শ্বশুরকে খুন করান।

আলাউদ্দিন ছিলেন একজন সমরকুশলী সুলতান। একটার পর একটা রাজ্য তিনি জয় করতে থাকেন। এভাবে ভারতে এক বিরাট

সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তিনি। দক্ষিণ ভারতের অনেক দেশও তিনি জয় করে নেন।

সে আমলে রাজপুতানায় মেবার নামে একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। মেবারের রাজধানী ছিল চিতোরগড়। চিতোরগড় ছিল একটি পাহাড়ী দুর্গ রাজধানী।

তখন মেবারের রাণা ছিলেন ভীমসিংহ। মেবারের রাণী পদ্মিনী ছিলেন অতি বড় রূপসী। তাঁর রূপের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করলেন।

নারীর মান বাঁচাতে অন্য রাজপুত রাজাও এগিয়ে এলেন আলাউদ্দিনকে বাধা দিতে। হাজার হাজার রাজপুত বীর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। চিতোর পাহাড় বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। পাহাড়ী ঝরনার জল রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চিতোর দুর্গের পতন ঘটল।

পরাজয়ের খবর রাণী পদ্মিনীর কানে আগেই পেঁাছেছিল। তাঁর আদেশে দুর্গের ভিতরে আগুন জ্বালা হল। রাণী পদ্মিনী নিজের মান বাঁচাতে সেই আগুনে নিজের জীবনকে আহুতি দিলেন। চিতোরের বীর জায়া, বীর রমণীরাও সেই চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের চরিত্র ছিল দোষে গুণে ভরপুর। তিনি খুব নিষ্ঠুর ছিলেন। হিন্দুদের তিনি খুব পীড়ন করতেন। মুসলমান প্রজাদের তুলনায় হিন্দু প্রজাদের দ্বিগুণ খাজনা দিতে হত। তাছাড়াও হিন্দুদের জিজিয়া কর (মাথট বা মাথাপিছু কর), গোচারণ কর, বসত কর এসবও দিতে হত।

অনেক ভাল কাজও আলাউদ্দিন করেছিলেন। তিনি জিনিসপত্রের দাম বেধে দিয়েছিলেন। জিনিস বেচাকেনা করার জন্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নিতে হত। ঠিক দরে ও ঠিক ওজনে জিনিস কেনাবেচার তদারকি করা হত। তদারকির জন্য দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ নামে কর্মচারী

নিয়োগ করা হত। পরিবারপিছু কোন জিনিস কতটা কেনা যাবে তাও ঠিক করে দেওয়া হত। কেউ নিয়ম মেনে না চললে কঠোর শাস্তি পেত। তবে দেশের সব জায়গায় এ নিয়ম চালু ছিল না। রাজধানী ও তার পাশাপাশি এলাকার লোকেরা এই সুবিধা ভোগ করত।

আলাউদ্দিন সাহিত্যিক ও পণ্ডিতদের সমাদর করতেন। কবি আমীর খসরু ও মীর হাসান তাঁর প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুফী সাধু নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন।

আলাউদ্দিন শেষ জীবনে খুবই অসুখী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিশ্বাসী সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন।

বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল।

খাম্‌খেয়ালী সুলতানের কাহিনী

খিল্‌জী বংশের পতনের পর, ভারতে তুঘলক বংশের শাসন শুরু হল।

গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক, তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বড় ছেলের নাম জুনা খাঁ।

বাবাকে হত্যা করে জুনা খাঁ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করলেন। তখন তাঁর নাম হল মহম্মদ্‌ বিন্‌ তুঘ্‌লক।



মহম্মদ বিন তুঘলক

মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন খেয়ালী সুলতান। কতকগুলি নতুন কাজ তিনি চালু করেছিলেন। তাতে ভালর বদলে মন্দ হয়েছিল। রাজা প্রজা দু' তরফকেই তার কুফল ভোগ করতে হয়েছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দেবগিরি ছিল দক্ষিণ ভারতে। তিনি দেবগিরির নাম বদলে দৌলতাবাদ নাম রেখেছিলেন।

রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে দিল্লী দৌলতাবাদ রাস্তা তৈরী করান হল। সাতশো মাইল রাস্তার দু'পাশে সরাইখানা খোলা হল। তারপর সুলতানের হুকুমে দিল্লীর লোকজন, সকলকে যেতে হল দৌলতাবাদে। কত লোক যে পথে কষ্ট পেয়ে মারা গেল, তার ঠিক নেই।

আট বছর পর দৌলতাবাদ থেকে দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে আনলেন। আবার সবাইকে দিল্লী ফিরে যেতে হল। আবার পথে অনেক লোকের মৃত্যু ঘটল।

ভারতে রূপার অভাব দেখা দিল। তিনি তামার নোট চালু করলেন। কিন্তু জাল নোট বন্ধ করার ব্যবস্থা করলেন না। ফলে সরকারী নোটের সঙ্গে জাল তামার নোটে বাজার ছেয়ে গেল। চাষীরা তামার নোটে খাজনা দিতে লাগল। ব্যবসায়ীরা তামার নোট নিয়ে জিনিস বেচতে রাজী হল না। দেশের সব জায়গায় গোলযোগ ও অশান্তি দেখা দিল।

সুলতান বাধ্য হয়ে তামার নোট তৈরী করা বন্ধ করলেন। রাজকোষে জাল মুদ্রা জমা দিয়ে আসল মুদ্রা নেওয়ার ফারমান জারী করলেন। রাজকোষ ফাঁকা হয়ে গেল।

মহম্মদ বিন্ তুঘলক শুধু যে খামখেয়ালী ছিলেন, তা নয়। তিনি ভীষণ জেদী বা একগুঁয়ে ছিলেন। খোরাসান ও ইরাক জয় করার নেশায় রাজকোষের অনেক টাকা খরচ হয়ে যায়। হিমালয় অঞ্চলের কারাজল (কুমায়ুন বা গাড়োয়াল) জয় করার জন্য তিনি এক বিরাট সেনাদল পাঠান। পথে অনেক সৈন্য মারা পড়ে। চীন ও তিব্বত জয়ের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন।

মহম্মদ বিন্ তুঘলকের অনেক গুণ ছিল। সাহিত্য কবিতা গণিত ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর অসীম জ্ঞান ছিল। তিনি মদ্যপান করতেন না।

তিনি কামলোলুপ ছিলেন না। অনেক হিন্দুকে তিনি উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করেছিলেন। খামখেয়ালী ও জেদী না হলে একজন মহান শাসক হিসাবে গণ্য হতেন তিনি।

এসেছে মোগল

পাঠান শাসনের পর ভারতে মোগল বা মুঘল শাসন শুরু হয়।

মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন জাহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর। তিনি ছিলেন তুর্কীস্থানের লোক। তাঁর মা ছিলেন মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁর মেয়ে। বাবরের প্রতিষ্ঠিত বংশকে তাই মোঘল বংশ বলা হয়।

তুর্কী ভাষায় বাবর মানে সিংহ। বাবর ছিলেন সিংহের মত বলশালী ও অসীম সাহসী। লোকে তাই তাকে বাবর বলত।

বাবর ছিলেন, মধ্য এশিয়ার ফারগানার (এখনকার রুশী তুরস্ক) রাজ্যের শাসক। মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি সিংহাসনে বসেন। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সমরখন্দ দখল করেন। কিন্তু আত্মীয়দের চক্রান্তে ও উজবেগ জাতির আক্রমণে তাকে রাজ্যহারা হতে হয়েছিল।

রাজ্যহারা হলেও বাবর হতাশ হয়ে পড়েননি। কাবুল ও আফগানিস্থানে তখন দারুণ গোলমাল চলছিল। সেই সুযোগে তিনি সে দেশ দখল করলেন। নিজেকে বাদশাহ বা সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

সে সময়ে ইব্রাহিম লোদী ছিলেন দিল্লীর সুলতান। তিনি খুবই অহঙ্কারী ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে রাজ্যের আমির-ওমরাহেরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ছিলেন তাঁর শত্রু। দৌলত খাঁ লোদী ইব্রাহিম লোদীকে জব্দ করতে চাইছিলেন। সেজন্য তিনি দিল্লী আক্রমণের জন্য বাবরকে অনুরোধ জানালেন।

বাবর দেখলেন এই তো সুযোগ। বিরাট সেনাদল নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন দিল্লীর দিকে।

দৌলত খাঁ ভেবেছিলেন ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিয়ে বাবর ফিরে যাবেন আপন রাজ্য ফারগানায়। পরে বুঝলেন যে, বাববের মতলব

অন্যরকম। তিনি চান দিল্লীর মসনদ। তিনি চান ভারতে একটা সাম্রাজ্য গঠন করতে।

দৌলত খাঁ তাই দিল্লী অভিযানে কোন সাহায্য করলেন না। বরং বিরোধিতা করেছিলেন। নানাভাবে জব্দ করতে চেয়েছিলেন বাবরকে।


বাবর

বাবরের এই অভিযান তাই সফল হয়নি। পাঞ্জাব থেকে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

দিল্লীর কাছেই পানিপথ মাঠ। শেষবারে পানিপথের মাঠে বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর ঘোরযুদ্ধ হয়।

ইব্রাহিম লোদীর ছিল চল্লিশ হাজার সেনা। বাবরের সৈন্য সংখ্যা মোট বার হাজার।

কিন্তু বাবরের সঙ্গে কামান ছিল। ইব্রাহিম লোদীর কামান ছিল না। ভারতে যুদ্ধে কামানের ব্যবহার এই প্রথম।

ইব্রাহিমের সৈন্যদলের সামনে ছিল হাতি-বাহিনী। বাবরের কামানের গোলায় হাতির দল পিছন ঘুরে পালাতে থাকল। হাতির পায়ের চাপে, সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

বারটি কামানের জোরেই বাবর যুদ্ধে জয়ী হলেন। ইব্রাহিম লোদী হলেন পরাজিত ও নিহত। ভারতে পাঠান শাসনের অবসান ঘটল।

কিন্তু বাবরকে আবার বিপদের মুখোমুখি হতে হল। তখন মেবারের রাণা ছিলেন সংগ্রামসিংহ।

তিনিও ভেবেছিলেন ধনরত্ন লুঠ করে বাবর দেশে ফিরে যাবেন। তিনি দিল্লী দখল করে আবার হিন্দুসাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন।

কিন্তু তাঁর সে আশায় ছাই পড়ল। বাবর দেশে ফিরে গেলেন না। উপরন্তু দিল্লীর আশপাশের এলাকা জয় করতে লাগলেন একটার পর একটা।

তাই-না দেখে সংগ্রামসিংহের টনক নড়ল। তিনি অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সঙ্গে জোট বাধলেন। কয়েকজন পাঠান দলপতিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এই জোট, বাবরের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে লাগল। তাঁরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললেন।

আগ্রার কাছেই খানুয়া। খানুয়ার মাঠে দু'দলে যুদ্ধ হল। বাবর হেরে গেলেন। সংগ্রামসিংহ বাবরের পিছু পিছু তাড়া না করে উদারতা দেখালেন। বীরত্বের অহঙ্কারে ছেড়ে দিলেন বাবরকে। তা না করে, তিনি বাবরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন। তাহলে ভারতে আবার হিন্দুরাজ চালু হত।

হেরে গিয়েও হতাশ হলেন না বাবর। তিনি নতুন করে সেনাদল গঠন করলেন। সেনাদলের মধ্যে কঠোর সংযম নিয়ম চালু করলেন। খানুয়ার মাঠে বাবরের সঙ্গে সংগ্রামসিংহের আবার যুদ্ধ হল। এ যুদ্ধে বাবর জয়ী হলেন।

বাবর শুধু সাহসী ও সমরকুশলী যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ভাল লেখাপড়া জানতেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। তুর্কী ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। তুর্কী ভাষায় তিনি নিজের জীবন-চরিত রচনা করেন। বইটির নাম, বাবর-নামা।

বাবর ছিলেন এক আদর্শ স্নেহশীল পিতা। তাঁর বড় ছেলে হুমায়ুনের কঠিন পীড়া হয়। বাঁচার আশা ছিল না। বাবর তখন একজন সুফী মোল্লার কাছে পরামর্শ চান। তিনি বাবরকে উপদেশ দেন তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আল্লাকে দান কর। তার বিনিময়ে ছেলের জীবন ভিক্ষা চাও। তাহলে তোমার ছেলে বেঁচে উঠবে।

সে কথা শুনে বাবর হুমায়ুনের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ান। বিছানার চারপাশ ঘুরে হাঁটুগেড়ে বসে প্রার্থনা জানালেন আল্লার কাছে।

আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দিলাম, নাওগো নাও।
আল্লা মহান, তার বদলে, ছেলের জীবন, ফিরিয়ে দাও॥

এই ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই হুমায়ুন রোগমুক্ত হলেন। আর মৃত্যু ঘটল বাবরের।

শাহী সড়কের শেরশাহ

ভারতের সবচেয়ে বড় রাস্তা—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড বা জি. টি. রোড। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামটি ইংরাজদের দেওয়া। তার আগে এ রাস্তার নাম ছিল শাহী সড়ক। সম্রাট শেরশাহের আমলে এ রাস্তা তৈরী হয়েছিল।

কে এই শেরশাহ? কেমন করে তিনি দিল্লীর সম্রাট হয়েছিলেন? সে কাহিনী গল্পকথার মত বড়ই মজাদার, বড়ই অদ্ভুত।

সাসারামের (বিহার) পাঠান জায়গীরদার হাসান খাঁয়ের ছেলে ফরিদ খাঁ। একা একটা শের (বাঘ) মেরে ফেলায় তাঁর নাম হয়ে গেল শের খাঁ।

ছেলেবেলায় তাঁর মা মারা যান। সৎমার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে হত। সৎমার অত্যাচারে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি ভালভাবে আরবী ও ফারসী ভাষা শিখেছিলেন। কিছুদিন এখানে ওখানে চাকরি করার পর ঢুকে পড়লেন বাবরের সেনাদলে। মোঘল সেনাদলের যুদ্ধ করার কায়দা-কানুন, রপ্ত করে নিলেন ভালভাবে।



শেরশাহ

বাবা মারা যাওয়ার পর সাসারামে ফিরে এলেন শের খাঁ। জায়গীরদার হলেন সাসারামের। জায়গীর ফিরে পেতে বাবর তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন।

জালাল খাঁ লোহানী তখন বিহারের সুলতান। বয়সে নাবালক।

শের খাঁ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। এখন তাঁর অভিভাবক হয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটল। বিহারের চুনারে একটি বিরাট দুর্গ ছিল। দুর্গের মালিক মারা গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী লাড মালিকাকে শের খাঁ বিয়ে করলেন। মালিক হয়ে বসলেন চুনার দুর্গের।

জালাল খাঁ লোহানীর আমীররা এই ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা জালাল খাঁকে বোঝালেন যে বড়ই বিপদ। শের খাঁর ক্ষমতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এখনই দমন না করলে, বিপদ ঘটতে পারে। জালাল খাঁকে হটিয়ে তিনি বিহারের সিংহাসন দখল করার মতলব করছেন।

তখন বাঙলার সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ।

দুই সুলতান একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

সুরজগড়ে যুদ্ধ হল। যুদ্ধে শের খাঁ জয়ী হলেন। তিনি বাঙলা ও বিহারের অধিপতি হয়ে বসলেন। ছিলেন সাসারামের জয়গীরদার, হলেন বাঙলা বিহারের সুলতান।

হুমায়ুন তখন মুঘল সম্রাট। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের সঙ্গে তাঁর ঘোর যুদ্ধ চলছে। তিনিও এ ঘটনায় খুব ভয় পেয়ে গেলেন। শের খাঁকে দমন করার জন্য তিনি এগিয়ে এলেন। মোঘল সৈন্যদল বাঙলা বিহারে এসে ছাউনি ফেলল। হুমায়ুন চুনার দুর্গ দখল করে নিলেন।

শের খাঁ ছিলেন বড়ই চতুর। তিনি সামনা-সামনি যুদ্ধের ঝুঁকি নিলেন না। মোগল সৈন্যদলের পাশ কাটিয়ে বিহার সীমান্তে চলে এলেন। তিনি চুনার দুর্গ আবার দখল করে নিলেন। তাছাড়া হুমায়ুনের নিজ রাজ্য বারাণসী ও কনৌজ দখল করে বসলেন।

হুমায়ুন দেখলেন ভারি বিপদ। দিল্লী তো শের খাঁর হাতের নাগালে আর তিনি রয়েছেন বহু দূরে বাঙলা বিহারে। হুমায়ুন বেশ বুঝতে পারলেন শের খাঁর কৌশলের কাছে তিনি হেরে গেছেন। তাই সিংহাসন

বাঁচাতে তিনি দিল্লীর দিকে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ চৌসায় শের খাঁর সৈন্যদল ঝড়ের বেগে ছুটে এল। ঝাঁপিয়ে পড়ল হুমায়ুনের সেনাদলের উপরে। হুমায়ুন পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। বাঙলা বিহার ছাড়াও শের খাঁ জৌনপুর দখল করে নিলেন। এই সময়ে তিনি শাহ উপাধি গ্রহণ করলেন। ছিলেন শের খাঁ ; হলেন শেরশাহ।



হুমায়ুন

সেনাদল নিয়ে হুমায়ুন আবার এগিয়ে এলেন শেরশাহকে দমন করতে। কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে হেরে গেলেন হুমায়ুন। ভারত ছেড়ে হুমায়ুন পালিয়ে গেলেন পারস্যে। শেরশাহ দিল্লীর সম্রাট হয়ে বসলেন।

মোটমাট পাঁচ বছর রাজত্ব করেন শেরশাহ। কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। এই পাঁচ বছরে তিনি একদিকে করেছেন রাজ্যজয় অন্যদিকে করেছেন শাসন-সংস্কার। তাঁর মত সুশাসক ভারতের ইতিহাসে বিরল। প্রজা কল্যাণই ছিল তাঁর শাসন-সংস্কারের উদ্দেশ্য। জমি জরিপ করিয়ে তিনি নতুন করে খাজনা ঠিক করেন। ফসলের $\frac{1}{3}$ বা $\frac{1}{4}$ অংশ খাজনা দিতে হত। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ করতেন না। ব্রহ্মাজিৎ গৌড় নামে এক বাঙালী ছিলেন তাঁর সেনাপতি। সাম্রাজ্যকে তিনি সাতচল্লিশটি সরকারে ভাগ করেন। কয়েকটি পরগণা নিয়ে একটি সরকার ও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পরগণা গঠন করেছিলেন। গ্রামের শাসন চালাত গ্রাম পঞ্চায়েত। জমির উপর মালিকানা পাকা করার জন্য প্রজাকে পাট্টা দেওয়া হত। প্রজাদের

কবুলিয়ৎ দিতে হত। কবুলিয়ৎ খাজনা দেওয়ায় ছাড়পত্র। শেরশাহ খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য 'ঘোড়ার ডাক' চালু করেন। যাতায়াতের উন্নতির জন্য তিনি অনেক রাস্তা তৈরী করান। শাহী সড়ক বা জি. টি. রোডের কথা আগেই বলা হয়েছে।

আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান

শেরশাহের বংশধরদের হাত থেকে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা উদ্ধার করলেন। কিন্তু রাজ্যভোগ তার কপালে বেশীদিন ছিল না। ছ' মাসের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

হুমায়ুনের ছেলের নাম আকবর। তাঁর বয়স তখন মোটে চোদ্দ বছর। ছেলেবেলায় এখান থেকে ওখানে ঘোরাঘুরি করায় লেখা-পড়াও শেখেননি। তবু এই বয়সেই তাঁকে বসতে হল দিল্লীর সিংহাসনে।


আকবর

তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। লেখাপড়া না জানলেও তাঁর অসাধারণ সামরিক প্রতিভা ছিল। আর ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি। এই পঞ্চাশ বছরে তিনি এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। উদার ব্যবহারে হিন্দু রাজাদের তিনি বশে আনেন। তিনি অম্বরের রাজা বিহারীমলের মেয়েকে বিয়ে করেন। তাঁর ছেলে সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সঙ্গেও এক রাজপুত রাজকুমারীর বিয়ে হয়। ধর্ম বিষয়েও তিনি উদার ছিলেন। দীন-ই-ইলাহি নামে এক নতুন ধর্মমত তিনি চালু করেছিলেন।

তাঁর উদার-নীতির বশীভূত হয়ে অনেক হিন্দু রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু মেবারের রাণা উদয়সিংহ তাঁর অধীনতা মেনে নিলেন না। আকবর তাই মেবার আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে উদয়সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে যান। আরাবল্লী পাহাড় এলাকায় নতুন রাজধানী গঠন করে মেবার শাসন করতে থাকেন মহারাণা উদয়সিংহ।

উদয়সিংহ মারা গেলেন। তাঁর ছেলে রাণা প্রতাপসিংহ বসলেন মেবারের সিংহাসনে। তিনি ছিলেন সাহসী, বলদর্পী ও সমরকুশলী। রাণা প্রতাপ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেননি। উপরন্তু চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা করতে লাগলেন। রাণা প্রতাপ চিতোর উদ্ধারের জন্য এক কঠোর পণ করেছিলেন ঃ

যতদিন নাহি করি চিতোর উদ্ধার।
সোনার থালায় নাহি করিব আহার ॥
বৃক্ষপত্রে খাদ্য রাখি করিব ভোজন।
তৃণ শয্যা বিছাইয়া করিব শয়ন ॥

হলদিঘাটের মাঠে রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাণা প্রতাপ হেরে গেলেন। বীর রাজপুত সৈন্যরা বীরের মৃত্যু বরণ করল। প্রতাপ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়।

এত দুঃখ-কষ্টেও ভেঙ্গে পড়েননি রাণা প্রতাপসিংহ। সেনাদল গঠন করে একটার পর একটা দুর্গ আবার দখল করে নেন। কিন্তু চিতোর উদ্ধার করতে পারেননি।

রাণা প্রতাপের বীরত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতবাসীর হৃদয়ে রাণা প্রতাপ আজও অমর।

আকবরের পর জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি মোট ২২ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর আমলে রাণা প্রতাপের ছেলে অমরসিংহ মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন।

বাঙলা দেশের নানা অঞ্চলে বারজন বাঙালী বীর স্বাধীন ভাবে শাসন চালাতেন। ইতিহাসে তাঁদের বারভুঁইঞা বলা হয়। বার ভুঁইঞাদের

মধ্যে যশোরের প্রতাপাদিত্যই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে তাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন ঃ—

যশের নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

জাহাঙ্গীরের আমলে প্রতাপাদিত্যকে দমন করা হয়েছিল।

জাহাঙ্গীরের প্রধানা বেগমের নাম ছিল নূরজাহান। আগে নূরজাহানের নাম ছিল মেহের উন্নিসা। শের আফগান তালিকুলি নামে এক সেনানায়কের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। শের আফগান তখন বর্ধমানের শাসনকর্তা।


জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর মেহের উন্নিসাকে ভালবাসতেন। কিন্তু আকবরের ভয়ে তখন কিছুই করতে পারেননি। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর কুতবুদ্দিন নামে এক সেনাপতিকে বর্ধমানে পাঠালেন শের আফগানকে দমন করার জন্য।

বর্ধমান শহরের অনতিদূরে শের আফগান ও কুতবুদ্দিন মুখোমুখি হয়েছিলেন। সামনা-সামনি যুদ্ধে দু'জনাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। শহর বর্ধমানের ময়ূর মহলে আজও দু'জনের সমাধি দেখা যায়।

মেহের উন্নিসাকে দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া হল। পরে তাঁকে বিয়ে

করলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। মেহের উন্নিসার নতুন নাম হল—নূরজাহান বা জগতের আলো।

জাহাঙ্গীর মারা গেলেন। তার তৃতীয় ছেলে খুরম দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। সিংহাসনে বসার পর তার নাম হল—শাহ্‌জাহান।

শাহজাহান ত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের দমন করেন। পর্তুগীজরা ইউরোপের পর্তুগাল থেকে এদেশে



শাহজাহান

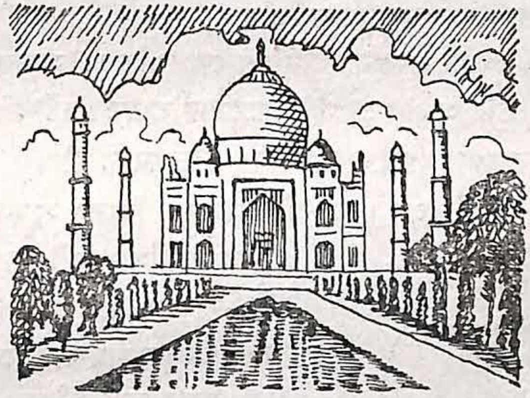
ব্যবসা করতে এসেছিল। তাদের অনেকেই নদীপথে ডাকাতি করত। তাদের সঙ্গে আরাকানের (ব্রহ্মদেশ) মগেরা যোগ দিয়েছিল। মগেরা খুব অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিল। কেউ অকারণে অপরের উপর অত্যাচার করলে আমরা এখনও বলি 'মগের মুলুক' পেয়েছে নাকি। মগের মুলুক কথাটির ভেতরে মগদস্যুদের অত্যাচারের স্মৃতি লুকিয়ে আছে।

শাহজাহানের আশ্চর্য কীর্তি—ময়ূর সিংহাসন। এমন বিচিত্র রত্ন-খচিত দামী সিংহাসন পৃথিবীতে আর দুটি নেই। সিংহাসন তৈরী

করতে সে আমলে (যখন টাকায় প্রায় আটমণ চাল পাওয়া যেত) প্রায় ছ' কোটি টাকা খরচ হয়েছিল।

শাহজাহানের আমলেই তাজমহল তৈরী হয়। তাজমহল একটি সমাধি মন্দির। শাহজাহানের প্রিয়তমা বেগমের নাম ছিল—মমতাজমহল। মমতাজমহলের সমাধির উপর তাজমহল গঠন করা হয়।

তাজমহল মার্বেল পাথরের তৈরী। দেওয়ালে নানারকম কারুকার্য ভর্তি। অনেক দামী পাথর ও মণিমুক্তা দিয়ে সাজানো হয়েছিল তাজমহলকে।



তাজমহল

তাজমহল তৈরী হতে সময় লেগেছিল বাইশ বছর। বিশ হাজার মজুর ও শিল্পীর মাথার ঘাম পায়ে ঝরে পড়েছিল—এই সমাধিমন্দির তৈরী করতে। আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে এই সমাধি মন্দিরটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের অন্যতম।

শাহজাহানের শেষ জীবন বড় দুঃখে কাটে! তার গুরুতর অসুখ হয়। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর চার ছেলে—দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ। কে সিংহাসনে বসবেন, তাই নিয়ে চার ছেলের মধ্যে লড়াই বেধে গেল। ঔরঙ্গজেব যুদ্ধে সবাইকে হারিয়ে দিলেন। তাঁর আদেশে দারা ও মুরাদকে হত্যা করা হল। সুজা ব্রহ্মদেশের আরাকানে পালিয়ে গেলেন। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

আগ্রার দুর্গে শাহজাহানকে বন্দী করে রাখা হল। জীবনের শেষ ক'বছর বন্দী থেকে মৃত্যু ঘটল শাহজাহানের। আদরের মেয়ে জাহানারা বন্দী অবস্থায় সেবাযত্ন করতেন শাহজাহানের।

রক্ত সিংহাসনে ঔরঙ্গজেব

মায়ের পেটের দু ভাইকে খুন করে, বাবাকে দুর্গে আটকে রেখে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

সিংহাসনে বসে তিনি উপাধি নিলেন আলম্‌গীর বাদ্‌শাহ গাজী। প্রায় ঊনপঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন তিনি।

ঔরঙ্গজেব ছিলেন একজন রণনিপুণ সেনাপতি। অনেক দেশ তিনি জয় করেন। তাঁর আমলে মোগল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাঁর আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ বোনা হয়।

ঔরঙ্গজেব বীর ছিলেন। সাহসী ছিলেন। ছিলেন সুদক্ষ সেনাপতি। সরল সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন তিনি। জীবনে মদ্যপান করেননি। ভোগবিলাস পছন্দ করতেন না।


ঔরঙ্গজেব

কিন্তু তার চরিত্রে দুটি বিরাট দোষ ছিল। তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসলমান। ঘোর হিন্দু বিদ্বেষী। আর তাঁর ছিল সন্দেহবাতিক মন। কাউকে তিনি বিশ্বাস করতেন না। নিজের ছেলেকেও না। সব কাজ নিজের দায়িত্বে করতেন।

ধর্মের গোঁড়ামিই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। ধর্মের গোঁড়ামিতে রাজপুতদের তিনি চটিয়ে দেন। মহামতি আকবর হিন্দুদের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে দিয়েছিলেন। তিনি আবার জিজিয়া কর বসালেন। তাতে রাজপুত রাজারা চটে যান।

মারবারের রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে তিনি দিল্লীতে এনে বন্দী করে রাখেন। তাদের মুসলমান করার মতলব করেন। তাঁরা দিল্লী থেকে পালিয়ে যান। মোগলসেনা মারবার আক্রমণ করে। ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। ঠিক এই সময় মেবারের রাণা রাজসিংহও মোগল সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করে। বাধ্য হয়ে তিনি রাণা রাজসিংহের সঙ্গে সন্ধি করেন। মেবারের উপর থেকে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন তিনি।

ঔরঙ্গজেব অনেক বিখ্যাত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন। হিন্দুদের ধর্মীয় মেলা ও যাত্রা (রাসযাত্রা, দোলযাত্রা) বন্ধ করে দেন। তাঁর আদেশে রাজপুত ছাড়া অন্য হিন্দুরা হাতী, পাল্কী বা ঘোড়ায় চেপে যাতায়াত করতে পারত না। তিনি হিন্দু ব্যবসায়ীদের শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক দিতে বাধ্য করেন তার ফলে—

জাঠ বুন্দেলা রাজপুত,
শিখ মারাঠাগণ,
বিদ্রোহ করে আনল ডেকে
মোগলের পতন।

তবে ঔরঙ্গজেবের আমলেই মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেনি। আকবরের সমদর্শী নীতি বাদ দিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। তার বংশধরদের সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছিল। তিনি মারা যাওয়ার পঞ্চাশ বছরের ভিতরেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল।

পাহাড়ী ইঁদুর শিবাজী

এক হিন্দু রাজা কিন্তু ঔরঙ্গজেবকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে ছিলেন। হাজার চেষ্টা করেও ঔরঙ্গজেব তাঁকে দমাতে পারেননি। শেষে তাঁকে রাজা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, দুঁদে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

তাঁর নাম ছত্রপতি শিবাজী। তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্র বা মারাঠার অধিবাসী ; মারাঠী।

দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্য বিজাপুর। বিজাপুর ছিল মোগল সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে। অনেক পরে ঔরঙ্গজেব বিজাপুর দখল করেন।

শিবাজী ছিলেন বিজাপুরের জায়গীরদার শাহজীর ছেলে। শিবাজীর মায়ের নাম ছিল জীজাবাঈ।



শিবাজী

শাহজী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, নতুন বউকে নিয়ে বিজাপুরে চলে যান। শিবাজী মায়ের কাছেই মানুষ হতে থাকেন।

দাদাজী কোণ্ডদেব নামে এক বীর তেজস্বী বামুন ছিলেন শিবাজীর শিক্ষক।

শিবাজী তাঁর কাছে ঘোড়ায় চাপা শেখেন। যুদ্ধবিদ্যা রপ্ত করেন। মায়ের মুখ থেকে রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনতেন শিবাজী।

গল্প শুনতেন আর ভাবতেন ঃ এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য তিনি গঠন করবেন।

মারাঠায় মাওয়ালী নামে এক উপজাতি ছিল। তিনি সমবয়সী মাওয়ালী যুবকদের নিয়ে এক সেনাদল গঠন করলেন। সেই সেনাদল নিয়ে এখানে সেখানে লুঠপাট করতেন। লুঠের টাকায় অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এসব কিনে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন।

এমন সময় মোগল সৈন্য বিজাপুর আক্রমণ করে। সেই সুযোগে শিবাজী বিজাপুরের সুলতানের কয়েকটি দুর্গ দখল করে নেন।

আফজল খাঁ ছিলেন বিজাপুরের দুর্ধর্ষ সেনাপতি। শিবাজীকে দমন করার জন্য আফজল খাঁকে পাঠান হল। আফজল সন্ধির ছলে

শিবাজীকে হত্যা করার মতলব ভাঁজলেন। কিন্তু শিবাজীই কৌশলে হত্যা করলেন আফজলকে।

এই ঘটনায় শিবাজীর সাহস বেড়ে গেল। তিনি মোগল সীমানায় ঢুকে লুঠপাট চালাতে শুরু করলেন।

সে খবর ঔরঙ্গজেব পেলেন। শিবাজীকে দমন করার জন্য তিনি তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন।

শায়েস্তা খাঁ ছিলেন জাঁদরেল সেনাপতি। কিন্তু শিবাজীর কৌশলে শায়েস্তা খাঁ শায়েস্তা হয়ে পালিয়ে গেলেন। শিবাজীর তরোয়ালের চোটে তাঁর হাতের আঙ্গুল কাটা গেল। তাঁর ছেলে আবুলফৎ প্রাণ দিল শিবাজীর অনুচরদের হাতে।

খবর পেয়ে ঔরঙ্গজেব পাঠালেন জয়সিংহ ও দিল্লীর খাঁকে। দুজনাই ছিলেন জবরদস্ত সেনাপতি।

বিরাট সেনাবাহিনী দিয়ে জয়সিংহ পুরন্দর দুর্গ ঘেরাও করলেন।

শিবাজী ছিলেন ধুরন্দর রাজনীতিবিদ। বেগতিক দেখে তিনি সন্ধি করলেন জয়সিংহের সঙ্গে।

জয়সিংহের কথায় শিবাজী আগ্রায় এলেন। সঙ্গে এল তাঁর ছেলে শম্ভুজী।

জয়সিংহের ছেলে রামসিংহ শিবাজী ও শম্ভুজীকে নিয়ে সম্রাটের দরবারে গেলেন। ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে পাঁচ হাজারী মনসবদার (সেনাপতি) পদে নিয়োগ করলেন।

কি অপমান! শিবাজী সে ঘটনার প্রতিবাদ করে বললেন—সম্রাট!

পাঁচ হাজারী মনসবদারী
কেবা যাচে তব কাছে!
আমার অধীনে সম্রাট! হেন
শত মনসবদার আছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে শিবাজী মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। তাঁকে ও তাঁর ছেলে শম্ভুজীকে দরবার থেকে নিয়ে যাওয়া হল।

জ্ঞান হওয়ার পর শিবাজী দেখলেন তিনি ও তাঁর ছেলে বন্দী।

বন্দীদশায় কিছুদিন কাটানোর পর শিবাজীর গুরুতর অসুখ করল।

বৈদ্যরা দু'বেলা আসছেন চিকিৎসার জন্য। খুবই কঠিন অসুখ। বুঝিবা মরণ ঘনিয়ে এসেছে শিবাজীর।

মঙ্গল কামনায় দেব মন্দিরে পুজা পাঠাতে লাগলেন শিবাজী। বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই ফল ও মিষ্টি পাঠান হতে থাকল আমীর-ওমরাহদের বাড়িতে।

প্রথম প্রথম প্রহরীরা ডালা খুলে দেখত কি আছে ঝুড়িতে। কিছুদিন পর তারা দেখা ছেড়ে দিল।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল শিবাজী ঘরে নেই। ঘরে নেই শম্ভুজীও।

তার আগেই ফল মিষ্টিভরা উপহারের ঝুড়ি প্রহরীরা নিয়ে গেছে ঘর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে সে খবর ছড়িয়ে গেল চারদিকে। দলে দলে ঘোড় সওয়ার ছুটল চারিদিকে শিবাজীর খোঁজে।

কোথায় শিবাজী! শিবাজী তখন সন্ন্যাসীর বেশে লুকিয়ে পড়েছেন। তারপর—

সন্ন্যাসী বেশে ঘুরি দেশে দেশে,
শিবাজী হাজির হন অবশেষে,
আপন রাজ্যে বহুদিন পরে ;
মারাঠাবাসীর আনন্দ না ধরে।

মারাঠার আনন্দের ধুম পড়ে গেল।

ঔরঙ্গজেব ঠাট্টা করে শিবাজীকে বলতেন—পাহাড়ী ইঁদুর। পাহাড়ী ইঁদুরের ক্ষমতা ও কৌশলের কাছে তিনি জব্দ হয়ে গেলেন। শিবাজীকে তিনি 'রাজা' খেতাব দিলেন। জায়গীর হিসাবে তাঁকে দান করলেন বেরার প্রদেশ।

ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন শিবাজী এবার খুশি হবে। বশে থাকবে। কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন। কিছুদিন চুপচাপ থেকে তিনি সুরাট

বন্দর লুঠ করলেন। যেসব দুর্গ মোগলরা কেড়ে নিয়েছিল আবার কেড়ে নিলেন সেগুলি। তারপর ছত্রপতি উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন।

শিবাজী ছিলেন ত্যাগী রাজা। সাধক রামদাস ছিলেন তাঁর গুরু। গুরুকে তাঁর রাজ্য দান করে দেন তিনি। গুরুর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করতেন। নারীদের তিনি সম্মান করতেন। তিনি নিজেকে বলতেন গো ব্রাহ্মণ প্রতিপালক। তাঁর পতাকা ছিল গেরুয়া রঙের। গেরুয়া ত্যাগের প্রতীক।

মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে শিবাজী মারা যান। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে হয়তো ভারতের ইতিহাস বদলে দিতেন তিনি। হয়তো ভারতে আবার হিন্দু রাজত্ব কায়েম হত।

শেষের সেই দিনগুলি

ঔরঙ্গজেব মারা গেলেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে কলহ বেঁধে গেল। সবাই চায় তখৎ-ই-তাউস (সিংহাসন) দখল করতে। শেষ পর্যন্ত বাহাদুর শাহ আর সবাইকে হটিয়ে বসলেন দিল্লীর সিংহাসনে।

কিন্তু যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল তা আর রোধ করা গেল না। সে প্রতিভা, সে দক্ষতা, সে সাহস, সে বুদ্ধি আর কোন মোগল সম্রাটের ছিল না। সেই যে বলে না "কোন রকমে ধাত রক্ষা করা।" ঠিক তেমনটি হল। কোনও রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে রইল মোগল সাম্রাজ্য। ওদিকে মারাঠারা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তারা মোগল সাম্রাজ্যের অনেকখানি এলাকা দখল করে নিয়ে গঠন করেছিল মারাঠা সাম্রাজ্য। পাঞ্জাবের শিখরাও মোগল সম্রাটদের উত্যক্ত করে ছেড়েছিল। কোনও কোনও এলাকার শাসকরা স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। তাঁদের কেউ-বা কর দিতেন। কেউ-বা তাও দিতেন না।

মোগল সাম্রাজ্য নামেই টিকে থাকল। আগেকার সে জলুস আর রইল না।

বাহাদুর শাহের পর তাঁর ছেলে জাহান্দার শাহ বসেছিলেন দিল্লীর সিংহাসনে। তাঁর ভাইপো ফাররুখ শিয়ার তাঁকে খুন করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করলেন। তারপর মহম্মদ শাহ হলেন দিল্লীর সুলতান। মহম্মদ শাহের শাসনকালে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর অত্যাচারে দিল্লী নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের আমলে আফগানিস্থানের অধিপতি আহমদ্ শাহ আবদালী দিল্লী আক্রমণ করেন। দিল্লীর পথে-ঘাটে রক্তের ঢেউ খেলে গেল। এইভাবে আরও কিছুদিন কাটল। তারপর দেশ জুড়ে শুরু হল সিপাহী বিদ্রোহ। সম্রাট বাহাদুর শাহ তখন দিল্লীর সম্রাট। সিপাহী বিদ্রোহের ঝোড়ো হাওয়ায় নড়বড়ে মোগল সাম্রাজ্য মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। ভারতে পাকাপাকি ভাবে শুরু হল বিদেশী জাতির শাসন। সে বিদেশী জাতির নাম ইংরেজ।

[দ্বিতীয় পর্ব]

সাগর পারের বিদেশী বণিকেরা

ভারত থেকে অনেক অনেক দূরের মহাদেশ ইউরোপ। ইউরোপ পৃথিবীর পশ্চিমদিকের একটি মহাদেশ। ইউরোপের দেশগুলিকে তাই বলা হয় পশ্চিমী দেশ বা পাশ্চাত্য দেশ।

ইউরোপে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ আছে।

ঐসব দেশের লোকজনের ভাষা আলাদা, খাদ্য আলাদা, পোশাক আলাদা, ধর্ম আলাদা, দেহের গড়ন আলাদা ; এমনকি গায়ের রঙও আলাদা ধরনের।

ইংল্যাণ্ডের লোকেদের বলা হয় ইংরেজ। ইংরেজ বণিকেরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। শুধু ইংরেজ নয়। পর্তুগাল, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের বণিকেরাও এদেশে ভিড় জমিয়েছিল। কিন্তু—

কোথা ইউরোপ ! ভারতবর্ষ
সেথা হতে কতদূরে।
কিসের আশায় এসেছিল তারা
সমুদ্র পথ ধরে ?

ইউরোপের বাজারে ভারতের এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মসলিন কাপড়, সোরা এসব জিনিসের খুব চাহিদা ছিল।

আগে পায়ে হাঁটা পথে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। পরে আরব দেশের মুসলমানরা তুর্কীস্থান দখল করে। আরব দেশের বণিকেরা ভারত থেকে ঐসব জিনিস কিনে ইউরোপের বাজারে বেচতে থাকে। তাদের বাধায় ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সরাসরি বাণিজ্য করা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু ইউরোপের বণিকরাই বা ছাড়বে কেন! তারা ভারতে আসার নতুন পথ খুঁজতে লাগল। ভারতে আসার হাঁটা পথ আরব বণিকদের

দখলে। তারা জল পথে ভারতে আসার পথ খুঁজতে লাগল। নানা দেশের নাবিকেরা সাগরে জাহাজ ভাসিয়ে দিল ভারতে আসার পথ খুঁজতে।

সাগর জলে, ভাসিয়ে জাহাজ,
তুলে দিলাম পাল,
যাবই যাব, ভারতবর্ষে,
আজকে না হয় কাল।
রেশমী কাপড়, মস্‌লিন,
এলাচ্, দারুচিনি
সরাসরি সেখান থেকে
আনব এসব কিনি।
আরব দেশের একচেটিয়া
ভাঙ্গতে অধিকার।
ভারত যাওয়ার জলপথ
করব খুঁজে বার।

কলম্বাস্ ছিলেন ইতালী দেশের নাবিক। তিনিই প্রথম পথের খোঁজে সাগরে জাহাজ ভাসালেন। অনেকদিন পরে তিনি পেঁছালেন আমেরিকার কাছাকাছি এলাকায়। তিনি ভেবেছিলেন তিনি ভারতে এসে গেছেন। সবাই তার কথা মেনেও নিয়েছিল। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের গায়ের রঙ লাল। তাদের তাই রেড ইণ্ডিয়ান বলে এখনও।

ইন্ডিয়া মানে ভারত। ইণ্ডিয়ান মানে ভারতীয়। আমেরিকাকে ভারত ভেবে ভুল করা হয়েছিল। তাই সেখানকার অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান নাম দেওয়া হয়েছিল।

ভারতে আসার জলপথ প্রথম খুঁজে বের করলেন ভাস্‌কোডাগামা। সে চারশ সত্তর বছর আগেকার কথা। ভারতে তখন লোদীবংশের (পাঠান আমল) রাজত্ব চলছে। সিকন্দর লোদী তখন দিল্লীর সুলতান। ভাস্‌কোডাগামা ঠিক সেই সময়ে ভারতে এসেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের

পশ্চিম সাগরকূলে কালিকট নামে একটি বন্দর ছিল। ভাস্কোডাগামার জাহাজ কালিকট বন্দরে এসে নোঙ্গর করল। তখন কালিকট ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। ভাস্কোডাগামা কালিকটের জামোরিণকে (রাজা) অনেক ধনরত্ন, জিনিসপত্র উপহার দিলেন। পর্তুগীজরা কালিকটে বাণিজ্য করার অধিকার পেল।

পর্তুগীজরা ভারতের নানা জায়গায় বাণিজ্য-ঘাঁটি তৈরী করেছিল। পরে তারা গোয়া অধিকার করে। দমন, দিউ, সলসেটি, বেসিন, বোম্বাই, চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে [এখন হুগলী জেলায়] বাণিজ্য কুঠি গড়ে তোলে।

অনেক পর্তুগীজ নাবিক জলপথে ডাকাতি করত। লোকজনের উপর নানারকম অত্যাচার করত। সম্রাট সাজাহানের আদেশে তাই পর্তুগীজদের দমন করা হয়। তাদের হুগলী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

পর্তুগীজদের পর ইংরেজ ও ডাচেরা (ওলন্দাজ) এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। আকবর তখন ভারতের সম্রাট। ঔরঙ্গজেবের আমলে ফরাসী ও দিনেমাররা (ডেনমার্ক) এদেশে বাণিজ্য করতে এসেছিল।

বাঙলাদেশের চুঁচুড়ায় ডাচেদের, চন্দননগরে ফরাসীদের এবং শ্রীরামপুরে দিনেমারদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। ঐ তিনটি এলাকা তারা শাসনও করত। পরে চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুর ইংরেজদের অধিকারে চলে আসে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ফরাসীরা চন্দননগর ছেড়ে চলে যায়।

গোয়া, দমন, দিউ পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক পরে ঐ তিনটি এলাকা দখল করা হয়। তার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল।

ইংরেজরা দাপটের সঙ্গে সারা দেশে ফলাও করে ব্যবসা শুরু করে দেয়। সারা দেশে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। সে এক বিরাট ভাঙ্গাগড়ার কাহিনী।

এস এস আজ তুমি ইংরাজ

আকবর তখন ভারতের সম্রাট। গোটা ভারত জোড়া তাঁর সাম্রাজ্য। ভয়ে ভক্তিতে ভারতের লোকেরা তাঁকে বলত দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা।

ইংল্যান্ডে তখন রাণীর শাসন চলছে। রানীর নাম এলিজাবেথ।

সে তিনশো তিরাশি বছর আগের কথা।

কয়েকজন ইংরেজ বণিক একটা কোম্পানী বা দল গঠন করল। কোম্পানির নাম ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। রানী এলিজাবেথ এই কোম্পানীকে সনদ (আদেশ-পত্র) দিলেন—ভারতে ব্যবসা করার জন্য। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করতে এল। সুরাটে একটা বাণিজ্য কুঠি তৈরী করল।

এলিজাবেথের পর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেছিলেন রাজা প্রথম জেমস।

প্রথম জেমস সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এক দূত পাঠিয়েছিলেন। দূতের নাম স্যার টমাস্ রো। টমাস রোর চেষ্টায় ইংরেজ বণিকেরা গুজরাটে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল।

সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে ইংরেজ বণিকেরা মাদ্রাজে বাণিজ্য কুঠি খোলার অনুমতি পায়। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বোম্বাই কোম্পানীর হাতে আসে।

বাঙলা দেশের হুগলীতেও ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। কুঠির কর্তা ছিলেন জব চার্ণক। ফৌজদারের আক্রমণে জব চার্ণক হুগলী ছেড়ে পালালেন। দুপুর রোদে বিশ্রাম নিতে গঙ্গাতীরে এক বটগাছের নীচে বসেছিলেন তিনি। জায়গাটি তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। তিনি তখনই ভেবেছিলেন—

আবার যদি ফিরে আসি হেথায় নদীতীরে।
বাণিজ্য এক কুঠি গঠন করব ধীরে ধীরে।
বিশ্ব মানব সেই শহরে করবে যাওয়া আসা,
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিটবে মনের আশা।

নদীতীরের সে জায়গাটির নাম কলকাতা। জলা-জঙ্গলে ভর্তি সেকালের একটা গ্রাম। দিনে বাঘ, রাতে ডাকাতের উপদ্রব।

তখন ছিল ঔরঙ্গজেবের শেষ বয়স। সম্রাটের দরবারে আর্জি পেশ করে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়া হল। জব চার্ণক বাঙলায় ফিরে এলেন।

হুগলীর বদলে কলকাতায় বাণিজ্য কুঠি তৈরী করলেন তিনি। কলকাতা থেকে হুগলী খুব দূরে নয়। হুগলীতে থাকলে কথায় কথায় মোগল ফৌজদারের সঙ্গে বিরোধ লেগে যাবে। বিরোধ এড়াতে জব চার্নক নতুন করে বাণিজ্য কুঠি তৈরী করলেন কলকাতায়।

ইংরেজ বণিকেরা পরে পাশাপাশি সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই দুটি গ্রামও কিনে নেয়। সেদিনের কলকাতা, সুতানুটি ও গোন্দিপুর—এই তিনটি গ্রামই বর্তমানের শহর কলকাতা।

কলকাতা ছাড়া ঢাকা, মালদহ ও কাশেমবাজারে (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল।

ঔরঙ্গজেব বেঁচে থাকতে, বিদেশী বণিকেরা এ-দেশে রাজ্যদখলে সাহসী হয়নি। ঔরঙ্গজেব মারা যেতে মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরল। ভারতবর্ষের এখানে সেখানে ছোট বড় অনেক রাজ্য গড়ে উঠল। কোনও রাজ্যে বা হিন্দু রাজা, কোনও রাজ্যে বা মুসলমান নবাব হয়ে বসল, রাজায় রাজায়, অথবা রাজায় নবাবে ঝগড়াঝাঁটি, লড়াই লেগেই থাকত। বিদেশী বণিকেরা তখন কুঠিরক্ষার জন্য সৈন্যদল রাখত।

বিদেশী বণিকদের সেনাদল ছিল যুদ্ধে অনেক পটু। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল উন্নত ধরনের। দেশীয় রাজা বা নবাবের সেনাদল তাই তাদের কাছে সহজেই হেরে যেত। সেজন্য তাঁরা একে অপরকে জব্দ করার জন্য বিদেশী সেনাদলের সাহায্য চাইত। কখনও বা বিদেশী সেনাদলের সাহায্যে পররাজ্য দখল করত। বিদেশী বণিকেরা সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য রাজা ও নবাবদের সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত।

বেশীর ভাগ রাজা ও নবাব ছিলেন বিলাসী। তাঁদের শাসনও ছিল ঢিলেঢালা ধরনের। কথায় বলে 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট।' এদেশে ঠিক সেই ঘটনাই ঘটেছিল। রাজকর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দিত। তাদের বেশীর ভাগই ছিল অলস, অসৎ ও বিলাসী। সৈন্যদলও ছিল তাই। তারা শৃঙখলা মেনে যুদ্ধ করতে জানত না। যুদ্ধবিদ্যা শেখার আগ্রহও ছিল না। এইসব দোষগুলি বিদেশী বণিকদের নজর এড়ায়নি। তারা

বুঝল এইতো সুযোগ। এই সুযোগে এদেশে রাজত্ব কায়েম করতে হবে। তাহলে ফলাও করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে।

এদেশে রাজত্ব করা নিয়ে ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে রেষারেষি লেগে গিয়েছিল। ইংরেজরা ভারত মহাসাগরে কয়েকটি ফরাসী জাহাজ দখল করে। তার বদলা নিতে ফরাসীরা মাদ্রাজ শহর দখল করে নেয়।

মাদ্রাজ ছিল কর্ণাটক রাজ্যের ভিতরে। তখন আনোয়ারউদ্দিন ছিলেন কর্ণাটকের নবাব। এই ঘটনায় তিনি রেগে গেলেন। তিনি দশ হাজার সেনাদল নিয়ে মাদ্রাজ অবরোধ করলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচশ' ফরাসী সেনার কাছে হেরে গেলেন তিনি। পরে সন্ধি হয় ও ইংরেজরা মাদ্রাজ ফিরে পায়।

কর্ণাটক ও হায়দরাবাদের ঘটনা নিয়ে নতুন করে বিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধে ইংরাজ ও ফরাসীরা জড়িয়ে পড়ল। কর্ণাটকে ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হায়দরাবাদে ফরাসী প্রভাব বজায় থাকে।

এদিকে বাঙলা দেশে তখন দুর্যোগের ঘনঘটা। বাঙলা দেশে ইংরেজ বণিকেরা তখন চুটিয়ে ব্যবসা করছিল। ফরাসীরাও পিছিয়ে ছিলেন। চন্দননগরে তাদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল। ফরাসীদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল বলেই চন্দননগরের আর এক নাম ফরাসডাঙ্গা। ইংরেজদের বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল কলকাতায়। কলকাতায় ইংরেজরা একটি গড় বা দুর্গ তৈরী করে ছিল। দুর্গটির নাম—ফোর্ট উইলিয়াম।

বাঙলা দেশে বাণিজ্য করার অধিকার নিয়েও ইংরেজ ও ফরাসীদের বেশ রেষারেষি ছিল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তখন বাঙলা বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা। নামে মোঘল সম্রাটের অধীন হলেও, বাঙলার নবাবরা স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করতেন।

খুব অল্প বয়সে সিরাজউদ্দৌলা বাঙলার নবাব হয়েছিলেন। তাঁর মা ছিলেন বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁর মেয়ে। শাসন চালাবার মত অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তখন তাঁর ঘরে-বাইরে শত্রু। তাঁর মাসী

ঘসেটি বেগম তাঁকে পছন্দ করতেন না। তাঁর মাসতুতো ভাই শওকৎজঙ্গ ছিলেন পূর্ণিয়ার নবাব। তাঁরা দুজনাই সিরাজকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করেছিলেন। পূর্ণিয়ার যুদ্ধে শওকৎজঙ্গ সিরাজের কাছে পরাজিত ও নিহত হন।

সিরাজউদ্দৌলার মেজাজ ছিল খুবই উগ্রপ্রকৃতির। কথার কথায় রাজকর্মচারীদের তিনি অপমান করতেন। তাই সেনাপতি মীরজাফর, ধনকুবের জগৎশেঠ, ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভ—সবাই সিরাজের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, নাটোরের রাণী ভবানী এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদার সিরাজকে পছন্দ করতেন না। তাঁরা সিরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। বাইরের শত্রু ইংরেজ এই সুযোগ পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল।



সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না। নতুন নবাবকে নজরানা বা উপহার দেওয়ার রীতি চালু ছিল। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা নবাব হওয়ার পর ইংরেজ বণিকেরা কোন নজরানা পাঠায়নি। সিরাজউদ্দৌলা তাই তাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ঢাকার শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভকে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান। তখন মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙলার নবাবের রাজধানী। রাজবল্লভ ভয় পেয়ে তাঁর ছেলে কৃষ্ণদাসকে ধনরত্ন সহ কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজরা কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিল। এই ঘটনায় সিরাজ ইংরেজদের উপর আরও রেগে গেলেন।

এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। ভারতেও ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধার ভয়ে ইংরেজরা কলকাতার দুর্গ মেরামতের কাজে হাত দিল। নবাবের নিষেধ কানেও তুলল না।

সিরাজউদ্দৌলা বুঝলেন ইংরেজকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বিরাট সেনাদল নিয়ে তিনি কলকাতা আক্রমণ করলেন। বেশীর ভাগ ইংরেজ জাহাজে চেপে ফলতায় পালিয়ে গেল। কিছু ইংরেজ নর-নারী নবাবের হাতে বন্দী হল।

সিরাজ কলকাতা দখল করলেন বটে, কিন্তু সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করে মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন।

ওদিকে মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ ও ওয়াটসন এলেন কলকাতা উদ্ধার করতে। অতি সহজেই তাঁরা কলকাতা দখল করে নিলেন।

খবর পেয়ে সিরাজউদ্দৌলা সেনাদল নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তিনি সন্ধি করলেন। সন্ধির ফলে ইংরেজ বণিকেরা অনেক সুযোগ-সুবিধা লাভ করল। ষড়যন্ত্রে ষড়যন্ত্রে সিরাজউদ্দৌলা তখন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। তাই যুদ্ধের বদলে এই অপমানজনক সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন তিনি।

ইংরেজরা সন্ধি করলেও সুযোগ খুঁজছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল —সিরাজ নবাব থাকলে নানা অসুবিধা ভোগ করতে হবে। উপরন্তু ফরাসীরা সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজরা তাই দরবারের ষড়যন্ত্রে যোগ দিল।

মিরমদন ও মোহনলাল ছিলেন সিরাজের দুই বিশ্বাসী সেনাপতি। তাছাড়া ফরাসীরাও ছিল সিরাজের সহায়। মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রাজবল্লভের দল তাই ভেবেছিল ইংরেজদের সাহায্য না নিলে সিরাজকে হটান যাবে না। তারা তাই ইংরেজদের দলে টেনে নিয়েছিল।

নাটোরের রাণী ভবানী কিন্তু নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন খাল কেটে পুকুরে কুমীর না ঢোকানই ভাল। কিন্তু তাঁর নিষেধ কেউ শোনেননি। ইংরেজ চরিত্র মোটেই বুঝতে পারেননি কেউ। তাঁরা ভেবেছিলেন নবাবীর পাকা আমটি সিরাজের কাছ থেকে ইংরেজরা কেড়ে নিয়ে মীরজাফরকে দেবে। আর তারা যেমন ব্যবসা করছিল তেমনি ব্যবসা করবে। তাঁদের মনোভাব তখন “এস এস আজ তুমি ইংরেজ।”

পলাশী, হায় পলাশী !

নদীয়া জেলার পলাশী। ভাগীরথী নদী তীরের ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের ভিতর বিরাট এক আমবাগান।

আজ থেকে দু'শো একত্রিশ বছর আগের কথা। সেদিন সেই আমবাগানে ভারতবাসীর ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা হয়েছিল। আর তার ফলে শুধু ভারত নয়, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল পলাশীর নাম।

কি সেই ঘটনা? সেই পুরানো দিনের পুরানো ঘটনা আবার নতুন করে বলা যাক।

আলিনগরের সন্ধির পর সিরাজ ও ইংরেজ দু'পক্ষই চুপচাপ ছিল।

ইংরেজরা ছিল সুযোগের অপেক্ষায়। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল—কোন্ ছলে টেনে নামান যায় সিরাজউদ্দৌলাকে।

শয়তানের ছলের অভাব হয় না। ছলের সন্ধান পেতে দেরী হল না—ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের।

শীঘ্রই দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের লড়াই বেঁধে গেল। ফরাসীরা সে লড়াইয়ে হেরে যায়। অনেক ফরাসী সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল বাঙলায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ক্লাইভ দেখলেন এই তো সুযোগ। ফরাসীদের আশ্রয় দিয়ে নবাব আলিনগরের সন্ধির চুক্তি ভেঙ্গেছেন। এই অজুহাতে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রবার্ট ক্লাইভ।

তার আগেই মীরজাফরের সঙ্গে গোপন চুক্তি হয়েছিল রবার্ট ক্লাইভের। মীরজাফর নবাবের সঙ্গে সৈন্য নিয়ে যাবেন। কিন্তু সৈন্যদের তিনি যুদ্ধ করার হুকুম দেবেন না। তিনি ও তাঁর সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রে।

রবার্ট ক্লাইভ তিন হাজার সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করতে রওনা

হলেন কলকাতা থেকে। ওদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এলেন ক্লাইভকে বাধা দিতে।

নদীয়া জেলার পলাশীর আমবাগানে দুই দলই ছাউনি ফেলল।

সিরাজের সৈন্যসজ্জা দেখে রবার্ট ক্লাইভ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুঃসাহসী তাই পিছিয়ে না গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন তিনি।

যুদ্ধের প্রথম দিকে নবাবেরই জয় হচ্ছিল। মীরজাফর তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু মীরমদন ও মোহনলালের আক্রমণে ইংরেজ সৈন্য পিছু হটতে লাগল। তারা আমবাগানের ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল।

এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটল। গোলার আঘাতে মীরমদন প্রাণ দিলেন। নবাব ভয় পেয়ে মিরজাফরকে তাঁর তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন। মিরজাফরকে যুদ্ধ করার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন। মিরজাফর কোরান ছুঁয়ে শপথ করলেন, তিনি যুদ্ধ করবেন। তবে সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিতে বললেন।

মীরমদন মারা গেলেও নবাবের সৈন্যরা হতাশ হয়ে পড়েনি। মোহনলালের আক্রমণে ক্লাইভের সৈন্যরা কেবলই পিছু হটছিল। বাঁচার পথ খুঁজছিল। আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললে ক্লাইভ অবশ্যই হেরে যেত। মিরজাফর তাই এই চালটি দিয়েছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার একে বয়স কম, তার উপর তিনি ছিলেন ভীতু প্রকৃতির। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মোহনলালকে যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। মোহনলাল যুদ্ধ থামাতে রাজী হলেন না।

এই সময় এক পশলা জল হলে ; নবাবের সৈন্যদলের বারুদ ভিজে গেল। ইংরেজদের বারুদ ঢাকা দেওয়ার মত আচ্ছাদন ছিল।

মিরজাফর আবার সিরাজকে যুদ্ধ থামাবার অনুরোধ জানালেন। নবাব আবার মোহনলালের কাছে লোক পাঠালেন। মোহনলাল কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইংরেজ সেনাদলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। মিরজাফর আবার নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানালেন। নবাব আবার লোক পাঠালেন মোহনলালের কাছে।

মোহনলাল আর নবাবের আদেশ অমান্য করতে সাহস পেলেন না। তিনি যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন। নবাবের সৈন্যরা তাঁবুর দিকে ফিরছেন। এমন সময়—

আবার হইল শুরু কামান গর্জন।
ইংরেজ পিছু হতে করে আক্রমণ॥
রণক্লান্ত নবাবের সৈন্যদল হায়।
দিশাহারা হয়ে পড়ে ছুটিয়া পালায়॥
গর্জিল মোহনলাল ; শোন সৈন্যগণ।
ফিরিয়া দাঁড়াও ; পুনঃ শুরু কর রণ॥
ইংরেজ সেনা যেন পালাতে না পারে।
আজিকার রণে শেষ করিব সবারে॥
কোথা মীরজাফর ! করে এহেন পাতক।
সমুচিত শাস্তি পাবে বিশ্বাসঘাতক॥

মোহনলাল অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু সৈন্যরা সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত। ভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটে পালাচ্ছে তাদিকে আর ফেরান গেল না। বারুদ ভিজে যাওয়ায় ঠিকমত কামান চালান গেল না। মোহনলাল যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। নবাবের পরাজয় ঘটল।

সিরাজউদ্দৌলা তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে পালিয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন, সৈন্যসংগ্রহ করে আবার যুদ্ধ করবেন ইংরেজদের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হল না। মুর্শিদাবাদে থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। সে কথা বুঝে পালিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু পথে ধরা পড়লেন। এক মুসলমান ফকির বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। সিরাজকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মীরজাফরের ছেলে মীরণের হুকুমে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়েছিল তাঁকে।

হায় পলাশী! সেদিন পলাশীর মাঠে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় শুধু নবাবের পরাজয় ঘটেনি। সেদিনই ভারত ও ভারতবাসীর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান ও দুর্দশার বীজ বোনা হয়েছিল পলাশীর রক্তরাঙা আমবাগানে। নদীয়া জেলার এক অখ্যাত, অপরিচিত গ্রাম ঠাঁই পেল পৃথিবীর ইতিহাসে।

পলাশীর পরে

মীরজাফর ভেবেছিলেন বাঙলার মসনদে বসে তিনি আপন খুশিমত রাজ্য শাসন করবেন। কিন্তু তা হল না। তিনি পুতুল নবাব হয়ে মসনদে বসে রইলেন। দেশ শাসনের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। ক্লাইভ যা বলতেন, তাঁকে তাই-ই করতে হত!

নবাবী পাওয়ার জন্য, মীরজাফর, ইংরেজদের অনেক টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সিরাজের রাজকোষ থেকে ক্লাইভ অনেক টাকা-কড়ি, ধনরত্ন লুঠ করেছিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁর আশা মেটেনি। পাওনা টাকার জন্য মীরজাফরকে বার বার তাগাদা দেওয়া হচ্ছিল, হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। তাগাদায় তাগাদায় মীরজাফর বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

ইংরেজদের পাওনা মেটাবার মত টাকা মুর্শিদাবাদের রাজকোষে ছিল না। তাছাড়া ইংরেজদের এত দাপট এত খবরদারী মীরজাফরের সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু মুখের উপর প্রতিবাদ করার সাহসও তাঁর ছিল না। তাই তিনি গোপনে ডাচ বণিকদের সঙ্গে চক্রান্ত শুরু করে দিলেন। তাঁদের সাহায্যে ইংরেজদের হটাতে চাইলেন বাঙলা দেশ থেকে। চুঁচুড়ায় তখন ডাচ বা ওলন্দাজদের বাণিজ্য কুঠি ছিল। চক্রান্তের কথা ইংরেজরা জানতে পারল। তারা তখন মীরজাফরের বদলে তার জামাই মীরকাসিমকে বাঙলার মসনদে বসাল।

মীরকাসিম মীরজাফরের মত কাপুরুষ ও অকর্মণ্য ছিলেন না। তিনি নিজের খুশিমত রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। মীরজাফরের আমলে কোম্পানীর কর্মচারীরা কোন শুল্ক না দিয়ে ব্যবসা করত। কিন্তু এদেশী ব্যবসায়ীকে শুল্ক দিতে হত। মীরকাসিম সকলকেই বিনা

শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার দিলেন। তার ফলে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধা হল। কিন্তু ইংরেজরা খুব রেগে গেলেন। মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ বেধে গেল।

মীরকাসিম মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী সরিয়ে মুঙ্গেরে (বিহার) নিয়ে গেলেন। নিজের সৈন্যদলকে ইউরোপীয় প্রথায় যুদ্ধবিদ্যা শেখানর ব্যবস্থা করলেন। এসব ঘটনায় ইংরেজরা ভয় পেয়ে গেল। ইংরেজদের পাটনা কুঠির শাসনকর্তা এলিস, পাটনা শহর দখল করে নিলেন। মীরকাসিম যুদ্ধ করে পাটনা শহর পুনরায় দখল করলেন।

কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধে মীরকাসিম ইংরেজদের কাছে হেরে গেলেন। রাজ্য ছেড়ে তিনি চলে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সাহায্যে তিনি নতুন করে সেনাদল গড়লেন। বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসিমের আবার যুদ্ধ হল। যুদ্ধে হেরে গিয়ে মীরকাসিম পালিয়ে গেলেন। ইংরেজরা মীরজাফরকে আবার বাঙলার মসনদে বসাল। মীরজাফর মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে নাজিম-উদ্-দৌলা হলেন বাঙলার নবাব। এই সময় ক্লাইভকে আবার বাঙলার গভর্ণর বা শাসনকর্তা করে পাঠান হল।

ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের এলাহাবাদ ও কোরা—এই দুটি প্রদেশ ছেড়ে দিয়েছিলেন। দেওয়ানী লাভের বিনিময়ে ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমকে দান করে দিলেন। তাছাড়া বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে রাজী হলেন। আরও চুক্তি হল যে, বাঙলার নবাবকে বছরে তিপান্ন লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।

ক্লাইভ এক নতুন শাসনব্যবস্থা চালু করলেন। এই ব্যবস্থায় নবাবকে খাজনা আদায় ও শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু এসব কাজ পরিচালনার ক্ষমতা থাকল কোম্পানীর হাতে। এই ব্যবস্থা চালু করে ক্লাইভ আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন।

এই শাসনব্যবস্থায় প্রজাদের খুবই দুর্গতি হয়েছিল। নবাবের

কর্মচারীরা নবাবকে তোয়াক্কা করত না। ইংরেজদের আশ্রয়ে থেকে, খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের উপর দারুণ অত্যাচার শুরু করে দিল। কিছুদিন পরেই বাঙলাদেশে এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাঙলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল। (দুশো উনিশ বছর আগে)। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষকে তাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে এই মন্বন্তরের কথা লেখা আছে। দুর্ভিক্ষে বাঙলার তিনভাগের একভাগ লোক মারা গিয়েছিল। বাঙলার তিনভাগের একভাগ জমি বনে-জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছিল।

মোগল আমলে দুর্ভিক্ষ হলে খাজনা মকুব করা হত। কিন্তু নবাবের কর্মচারীরা দুর্ভিক্ষের বছরেও জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করেছিল। নবাবের তো কোন ক্ষমতাই ছিল না। কোম্পানীর কর্মচারীরাও লোকের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। বরং অনেকে চড়া দরে চাল বেচে রাতারাতি ধনী হয়ে গিয়েছিল।

নন্দকুমারের ফাঁসি হল

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা লণ্ডনে পৌঁছাল। কোম্পানীর কর্তারা তখন ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাঙলার গভর্ণর বা শাসনকর্তা করে পাঠালেন। হেস্টিংস পরে গভর্ণর জেনারেল উপাধি পান।

ইংরেজ জমিদারের উপাধি লর্ড। তাঁরা নামের আগে লর্ড লিখতেন। এদেশী লোকেরা লর্ডকে লারড উচ্চারণ করতেন। লারড থেকে লাট সাহেব শব্দটি এসেছে।

গভর্ণর জেনারেলদের বেশীর ভাগই ছিল লর্ড পরিবারের লোক। সাধারণ লোকেরা গভর্ণর জেনারেলকে তাই লাটসাহেব বলত। অবশ্য ওয়ারেন হেস্টিংস লর্ড পরিবারের লোক ছিলেন না।

হেস্টিংস তের বছর বাঙলার গভর্ণর ছিলেন। তিনি এসে নবাবের হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। কোম্পানি দেশশাসনের সব দায়িত্ব

গ্রহণ করল। মুর্শিদাবাদের বদলে কলকাতাকে বাঙলার রাজধানী করা হল। জেলায় জেলায় ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করা হল। বড় বড় মামলা-মোকদ্দমার বিচারের জন্য কলকাতায় তিনটি প্রধান আদালত খোলা হল। হেস্টিংসের আমলেই বাঙলা বিহার উড়িষ্যায় পুরোপুরি ইংরেজি শাসন কায়েম হয়।

হেস্টিংসের আমলে মারাঠাদের সঙ্গে ও মহীশূরের হায়দার আলির সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। হেস্টিংস অযোধ্যার নবার সুজাউদ্দৌলাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। সৈন্য সাহায্য পেয়ে সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের রাজ্য অধিকার করেন। হেস্টিংস সেজন্য সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে অনেক টাকা আদায় করে নেন।

হেস্টিংস শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা খোলেন। তাঁর আমলেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি খোলা হয়। এ ব্যাপারে স্যার উইলিয়ম জোন্‌সকে তিনি বিশেষ সাহায্য করেন।

হেস্টিংসের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তিনি একটি দারুণ অন্যায় কাজ করেছিলেন। তাঁর আমলেই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। আর এই ফাঁসির জন্য তিনি নিজে দায়ী। ইংরেজ আমলে সেই প্রথম একজন বাঙালী তথা ভারতীয়কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। বিনাদোষে, মিথ্যা অভিযোগ এনে, তুচ্ছ কারণে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই ফাঁসি দেওয়ার ঘটনায় হেস্টিংসের চক্রান্ত ছিল তাই আদালত থেকেও কোন সুবিচার পাননি মহারাজ নন্দকুমার।

নন্দকুমার ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। বীরভূম জেলার ভদ্রপুরের অধিবাসী। তিনি শিক্ষিত, সাহসী, রণনিপুণ ও বেশ করিৎকর্মা লোক ছিলেন। রাজনীতি তিনি ভালই বুঝতেন। শাসনকার্যে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। অংকশাস্ত্র এবং রাজস্ব-নীতিতেও তাঁর বেশ দখল ছিল। বাঙলার নবাবের অধীনে তিনি হিজলী ও মহিষাদল পরগণার তহশিলদারের কাজ করতেন।

আলিবর্দি মারা গেলে, বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে হুগলীর

ফৌজদার নিযুক্ত করেন। সেই সময় ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধে। ইংরেজসেনারা কলকাতা থেকে চন্দননগর দখল করতে যায়। সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজ সেনাদলকে বাধা দেবার জন্য নন্দকুমারকে নির্দেশ দেন। কিন্তু নন্দকুমার সে নির্দেশ অমান্য করেন। সেজন্য সিরাজউদ্দৌলা তাঁকে পদচ্যুত করেন।

সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মীরজাফরকে বাঙলার মসনদে বসান হয়। এই সময়ে নন্দকুমার বাঙলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ ও রাজা উপাধি পান। তখন থেকেই তিনি মহারাজ নন্দকুমার নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর কালেকটর (রাজস্ব সংগ্রাহক) পদে নিয়োগ করেন। পরে তাঁকে বাঙলার নায়েবসুবা পদে নিয়োগ করা হয়।

হেস্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণিবেগমের কাছ থেকে অনেক টাকা উৎকোচ বা ঘুষ নেন। গভর্ণরের কাজে সাহায্য করার জন্য, একটি 'কাউনসিল' বা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সেই কাউনসিলের কাছে মহারাজ নন্দকুমার এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। হেস্টিংসের ভয়ে কেউ সাক্ষী না দেওয়ায় সে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি।

এ ঘটনায় হেস্টিংস খুব অপদস্থ হন। অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি নানারকম চক্রান্ত শুরু করে দিলেন।

বারওয়েল নামে কাউন্সিলের এক সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন হেস্টিংসের সমর্থক। হেস্টিংসের নামে মিথ্যা অভিযোগ আনার দায়ে তিনি আদালতে নন্দকুমারের নামে নালিশ দায়ের করলেন। এই মামলায় নন্দকুমার হেরে গেলে, তেমন কিছু শাস্তি হল না। তাই নন্দকুমারকে চরম শাস্তি দিতে, জালিয়াতির অভিযোগ আনা হল। হেস্টিংসের চক্রান্তে কামালউদ্দিন নামে এক মুসলমান ব্যবসায়ী সুপ্রিম কোর্টে, নন্দকুমারের নামে দলিল জাল করার নালিশ জানালেন।

স্যার ইলাইজা ইম্পো তখন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। তিনি ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। বিচারে তিনি নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়ার

আদেশ দিলেন। সেকালে ইংল্যাণ্ডে জালিয়াতি করার জন্য ফাঁসি দেওয়া হত। ভারতে সে আইন চালু ছিল না। ভারতীয় আইন অনুযায়ী তখন এ দেশের লোকেদের বিচার হত। কিন্তু নন্দকুমারের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল। ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর ফাঁসির আদেশ দেওয়া হল। হেস্টিংসের অনুরোধে ও চাপে পড়ে স্যার ইলাইজা ইম্পো এরকম আদেশ দিয়েছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন।

সতেরশো পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দের পাঁচই আগষ্ট। আজ থেকে দুশো তের বছর আগের ঘটনা। ঐদিন নন্দকুমারে ফাঁসির দিন ধার্য হয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক ফাঁসির আদেশ রদ করার অনুরোধ জানাল। বাঙলার নবাবও ফাঁসি না দেওয়ার জন্য হেস্টিংসকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেন। কিন্তু হেস্টিংস কারও কথায় কর্ণপাত করেননি।

নন্দকুমারের ফাঁসির দিন কলকাতার প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে অরন্ধন (রান্না না করা) পালিত হয়। মহারাজ নন্দকুমার হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করেন। ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পরে, অনেকেই পাপ মুক্তির জন্য গঙ্গাস্নান করেন। অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দু কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়ে, অন্য জায়গায় বাস করতে থাকেন। মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসি হয়েছিল বলে ভারতবাসীর মনে মহারাজ নন্দকুমার আজও অমর।

সিপাহী বিদ্রোহ

আজ থেকে একশো উনত্রিশ বছর আগের কথা। লর্ড ডালহৌসী তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট।

ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে লর্ড ডালহৌসীর আমল। এই সময়ের মধ্যে বাহাত্তর বছর পার হয়ে গেছে। ভারতের ছোট বড় অনেক রাজ্য কোম্পানী দখল করে নিয়েছে। কোম্পানীর ভয়ে অনেক রাজা মহারাজা নবাব, তাদের কথামত রাজ্য শাসন করছে।

এই সময়ের মধ্যে দেশেরও অনেক উন্নতি হয়েছিল। দেশশাসনের অনেক নতুন আইন-কানুন চালু করেছিল ইংরেজরা। দেশে ইংরেজি

শিক্ষা চালু হয়েছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অনেক নতুন পথঘাট তৈরী ও মেরামত করায় যাতায়তের সুবিধা হয়। ডালহৌসীর আমলে দেশে রেলপথ খোলা হয়েছিল। ডাকে চিঠি পাঠান, টেলিগ্রাফে খবর পাঠান—এসব ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, শহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপন করা হয়েছিল। ঠগ ও পিণ্ডারী দস্যুদের দমন করায় লোকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাতায়াত করতে পারত।

এই সময়ে অনেক সামাজিক কুপ্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিধবাবিবাহ চালু করা হয়েছিল।

দেশে অনেক কলকারখানা খোলা হয়েছিল। এই সময় নতুন এক ধরনের জমিদারী প্রথা চালু হয়। তার নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এই আমলে দেশের কুটির শিল্প একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয়। ইংরেজ কোম্পানীর তৈরী কলকারখানার জিনিসে বাজার ছেয়ে যায়। বিদেশের তৈরী জিনিসও এদেশের বাজার দখল করে বসে। শিল্পীরা বেকার হয়ে যায়। সবাই চাষবাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে জমির উপর চাপ পড়ে। নীলকররা জোর করে চাষীদের জমিতে বীজ বুনত। তাদের অত্যাচারে চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

নানাকারণে দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কি চাষী, কি শ্রমিক, সকলেরই অবস্থা তখন শোচনীয়। ইংরেজি শিখে অনেকে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছিল। আগে কেউ অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে, বিষয়-সম্পত্তির ভাগ পেত না। আইন করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেকে ভেবেছিল ইংরেজরা জোর করে সবাইকে খৃষ্টান করতে চায়। তাই এরকম ধর্মান্তর আইন চালু করা হয়েছে।

ইংরেজি শিখে অনেকে তখন কল-কারখানা, অফিসে চাকরি করত। তাদের অবস্থা অবশ্য ভালই ছিল। অবশ্য তাদের সংখ্যা খুব কম। জমিদারদের অবস্থাও মোটামুটি ভাল ছিল।

দেশীয় রাজা মহারাজা নবাবরা তখন খুব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। সকলেই ভয় করত—বুঝিবা কোন অজুহাতে ইংরেজরা তাদের রাজ্য দখল করে নেয়। তাঁরা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে তা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদিকে।

নানাদিকে দেশের উন্নতি হলেও সকলের অসন্তোষ দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার নবাবের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজামের বেরার প্রদেশ দখল করে নেওয়া হয়। অপুত্রক রাজারা মারা গেলে তাঁদের পোষ্যপুত্ররা রাজা হতেন। লর্ড ডালহৌসী আইন করে পোষ্যপুত্রদের সে অধিকার কেড়ে নেন। তার ফলে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্য কোম্পানীর দখলে আসে। পেশোয়া বাজীরাওয়ের রাজ্য আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তার বদলে তাঁকে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হত। তাঁর কোন ছেলে ছিল না। তাঁর পোষ্যপুত্রের নাম ছিল নানাসাহের। পেশোয়া মারা গেলে ডালহৌসী নানাসাহেবকে বৃত্তি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। লর্ড ডালহৌসী দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে দিল্লী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তার ফলে দেশের মুসলমানেরা ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।

দখল করা রাজ্যের প্রজা, রাজকর্মচারী সবাই ইংরেজ শাসনের উপর বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কোম্পানীর সেনাদলে অনেক দেশীয় সিপাহী ছিল। তাদের উপর ইংরেজ সেনাপতিরা খুব দুর্ব্যবহার করত। তাদের বেতন ইংরেজ সিপাহীদের তুলনায় অনেক কম ছিল। সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর সংখ্যাই ছিল বেশী। তাদের ধারণা ছিল, ইংরেজরা তাদের ধর্মনাশ করে খৃষ্টান করতে চায়। দেশীয় সিপাহীরা তাই ইংরেজ শাসনের প্রতি দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আগুনে ঘি পড়লে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। একটি ঘটনায় দেশীয় সিপাহীদের অসন্তোষ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

ইংরেজ সেনাদলে, এ সময়ে নতুন এক ধরনের বন্দুক চালু করা হয়েছিল। এই বন্দুকের নাম—এনফিল্ড রাইফেল। এই ধরনের বন্দুকের

টোটা দাঁতে কেটে নলের ভিতরে পুরতে হত। টোটায় চর্বি মেশান থাকত। আগে থেকেই হিন্দু মুসলমান সিপাহীদের মনে ধর্মনাশের ভয় ছিল। নতুন বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটতে হওয়ায় তাদের ভয় ও সন্দেহ বেড়ে গেল। এমন সময় চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল টোটায় গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশান আছে। তাদের ধারণা হল ইংরেজরা কৌশলে তাদের ধর্মনাশ করছে। তারা রেগে ফেটে পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সিপাহীরা এই বিদ্রোহ শুরু করায় এই বিদ্রোহের নাম সিপাহী বিদ্রোহ।

কলকাতার কাছাকাছি ব্যারাকপুর ও মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে সেনানিবাস ছিল। এই দুটি সেনানিবাসের সিপাহীরা প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পরে সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লী, কানপুর মীরাট, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, বিহার, বেনারস প্রভৃতি রাজ্যের সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সিপাহীরা দিল্লী ও মোগল বাদশাহের দিল্লীর প্রাসাদ দখল করে নিল। বৃদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলে ঘোষণা করল।

এই সুযোগে নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করলেন। তিনি কানপুরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ঝান্সীর বীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর দত্তকপুত্রকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ঝান্সীর রাণী তাঁর সেনাদল নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মারাঠা বীর তাঁতিয়াতোপীও বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতিয়াতোপী মধ্য ভারতের বিদ্রোহী দলকে পরিচালনা করেন।

বিদ্রোহী সিপাহীরা খুব সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও শেষে পরাজিত হয়। তার নানা কারণ ছিল। ইংরেজদের মত কামান বন্দুক তাদের ছিল না। ইংরেজদের রণকৌশলও তাদের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। বিদ্রোহী সিপাহীদলের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ছিল। নানাসাহেব, তাঁতীয়াতোপী ও রাণী লক্ষ্মীবাঈ বীর ও সাহসী হলেও,

সেনাদল পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল না। অনেক দেশীয় রাজা মহারাজা ও নবাব বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। কাশ্মীরের গুলাব সিংহ মারাঠাবীর সিন্ধিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামে ও ভূপালের বেগমের দানই ছিল সবচেয়ে বেশী। পাঞ্জাবের শিখ ও নেপালের গোর্খারা বিদ্রোহ দমনে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। দেশীয় রাজারা বিদ্রোহ দমনে সাহায্য না করলে হয়ত সিপাহীদের পরাজয় ঘটত না। ফলে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটত। অনেকে তাই সিপাহী বিদ্রোহকে **"ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম''** বলে উল্লেখ করেন।

বীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তাঁতীয়াতোপীকে বন্দী করে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরাজিত নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে



রাণী লক্ষ্মীবাঈ



তাঁতিয়াতোপী

পালিয়ে যান। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসনে পাঠান হয়। বাহাদুর শাহের দুই পৌত্রকে গুলি করে মেরে ফেলা হল। ভারতের মাটি থেকে মুঘল শাসনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল একেবারে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ হল। ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। তাঁকে ভারত-সম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষণা করা হল।

কোম্পানী শাসনে দেশের লোক ইংরেজদের প্রতি খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছিল। দেশীয় রাজা মহারাজা ও নবাবরাও নিজেদের খুব অসহায় বোধ করতেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরাও দিনে দিনে অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছিলেন। সকলের মন থেকে অসন্তোষ দূর করার জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। সেই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—

অন্যায় ভাবে দেশীয় রাজ্য অধিকার করা হবে না।

হিন্দু মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হবে না।

শিক্ষিত ও যোগ্য ভারতবাসীরা বড় বড় সরকারি চাকরি পাবে।

লোহার বাসর ঘর তৈরী করে লখীন্দরকে বাঁচান যায়নি। তেমনি সুযোগ-সুবিধার হাজার কথা বলেও, দেশবাসীর স্বাধীনতার ইচ্ছাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। দেশবাসীর মনে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে। তার ফলে দেশের নানা জায়গায় আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দুটি পথে ভাগ হয়ে যায়। একটি সন্ত্রাসবাদ বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ। অন্য পথটি হল শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনের পথ। দুটি পথের মিলনই বিদেশী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথকে সুগম করেছিল।

সশস্ত্র বিপ্লবের কাহিনী

ইংরেজ আমলে দেশে নতুন ধরনের শিক্ষার ঢেউ বয়ে যায়। এসময় দেশে মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানা খোলা হয়। এইসব ছাপাখানা থেকে অনেক নতুন ধরনের বই ছাপা হতে থাকে। অনেক মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সব বই ও সংবাদপত্র পড়ে দেশের লোক, দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেশকে তারা দেশজননী বলে চিনতে শেখে। দেশবাসীকে তারা ভাই বলে মনে করতে থাকে। মনের এই নতুন ধারণার নামই নবজাগরণ।

নবজাগরণের ফলে দেশের লোকের মনে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়। জাতীয়তাবোধ কি? তা স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়লেই বোঝা

যায়—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ! ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—দেশ ও দেশবাসীর প্রতি এই মমতাবোধের নামই জাতীয়তা।

জাতীয়তাবোধ বা নবজাগরণ হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। তার জন্য অনেক সাধক, অনেক মনীষী, অনেক শিক্ষাবিদ, অনেক লেখক—অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাঁরা হলেন, রাজা রামমোহন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ



রামকৃষ্ণ



বিবেকানন্দ

ঠাকুর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। স্বামী বিবেকানন্দ। কেশব সেন। ডেভিড হেয়ার। ডিরোজিও। বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথমে দেশকে মা বলে ডাকতে শেখান। তাঁর লেখা আনন্দমঠে বন্দেমাতরম নামে একটি গান আছে। এই 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করে অনেক দেশবাসী স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বন্দেমাতরম গানের প্রথম স্তবকটি ভারতের জাতীয় স্তোত্র।

কিছু কালের মধ্যেই সারা দেশে জাতীয়তাবাদের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল। দেশের শিক্ষিত যুবকেরা ইংরেজদের শাসন ও শোষণ মুখ বুজে মেনে নিতে চাইল না। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা কারণে অকারণে দেশবাসীকে পীড়ন করত। একদল শিক্ষিত যুবক অত্যাচারের শোধ নেওয়ার জন্য

মরিয়া হয়ে উঠল। তারা দেশের নানা জায়গায় গুপ্ত-সমিতি গঠন করেছিল। এই গুপ্ত-সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল—

(ক) অত্যাচারী ইংরাজ কর্মচারীদের হত্যা করা। তাহলে ভয়ে আর কেউ এ ধরনের কাজ করবে না।

(খ) ইংরেজ শাসনের অবসানের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব করা।

ভারতের মধ্যে মহারাষ্ট্রে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়। সে আজ থেকে একশো দশ বছর আগের ঘটনা।

সে সময়ে মহারাষ্ট্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষে দেশবাসীর কষ্টের শেষ থাকে না। বিদেশী শাসক দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য মোটেই নজর দেয়নি। সেই সময়েই দিল্লীতে ধুমধামের সঙ্গে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপাধি গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়।

এই ঘটনায় বাসুদেব বলবন্ত ফাড়্কে খুব বিচলিত হন। তিনি বিদেশী সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। বিদেশী সরকারের এই অবহেলা তার সহ্য হল না। তিনি দেশ থেকে বিদেশী শাসকদের উচ্ছেদ করতে চাইলেন।



ফাড়্কে

অবহেলিত রামোসি জাতির যুবকদের নিয়ে তিনি একটি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে 'দ্বিতীয় শিবাজী' বলতেন।

বিপ্লবী দলের খরচ চালানর জন্য তিনি সরকারী কোষাগার লুঠ করেন। কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতিও করেন। পাঁচশো রোহিলা সেনা যোগাড় করে তিনি বিপ্লব করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ খবর জানাজানি হয়ে যায়। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে ফাড়্কেকে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেলের ভেতরেই ফাড়্কে মারা যান।

ফাড়্কের চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু একেবারে বিফলেও যায়নি। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে ভারতের নানা জায়গায় অনেক গুপ্ত-সমিতি গড়ে ওঠে।

মহারাষ্ট্রের বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম শহীদ, দুই ভাই। তাঁদের নাম—দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার।

আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগেকার ঘটনা। সে সময় মহারাষ্ট্রে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। প্লেগ রোগীদের বাড়ি থেকে সরিয়ে আলাদা জায়গায় রাখার আদেশ দেওয়া হয়। সেখানে সেবা, চিকিৎসা ও পথ্যের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া বাড়ি ছেড়ে কেউ ভয়ে যেতেও চাইত না। তাই প্লেগ হলেও অনেকে রোগ লুকিয়ে রাখত। প্লেগ অতি ছোঁয়াচে রোগ। তার ফলে সুস্থ লোকজনের মধ্যে তাড়াতাড়ি রোগ ছড়িয়ে পড়ছিল।

প্লেগ হলে প্রথমে, দাবনা ও তলপেটের খাঁজের কাছে কুঁচ্কি ফুলে ওঠে। তা দেখলেই বোঝা যায় প্লেগ হয়েছে কিনা। দুজন ইংরেজ কর্মচারীকে প্লেগ রোগীদের বাছাই করা ও সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার দেওয়া হয়। তাঁদের নাম র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট।

র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্ট রোগী বাছাইয়ের নামে রোগীদের খুব পীড়ন করত। এমনকি মহিলাদের সঙ্গেও অশালীন ব্যবহার করতে ছাড়ত না। ভয়ে সাধারণ লোক কিছু বলতে পারত না। তাদের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করত।

বাল গঙ্গাধর তিলক তখন ভারতের লোকমান্য নেতা। তিনি ছিলেন মারাঠী। ঐ অত্যাচারের প্রতিবাদে এক জনসভা ডাকা হয়। সেই জনসভায় তিনি জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে চাপেকার দুই ভাই র‍্যাণ্ড ও আয়ার্স্টকে হত্যা করেন। দুই ভাই'ই ধরা পড়েন। দু'জনাকেই ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

তিলকের ভাষণই চাপেকার দুই ভাইকে এ কাজে সাহস যুগিয়েছে।

এই অপরাধে তিলকের নামে রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়। বিচারে তিলককে আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রে 'বাল সমাজ' ও 'আর্য বান্ধব সমাজ' নামে দুটি নামকরা গোপন বিপ্লব সমিতি ছিল। আর্য বান্ধব সমাজ ভীল ও গোণ্ড উপজাতিদের নিয়ে বিপ্লবী সেনাবাহিনী তৈরী করার চেষ্টা করে। ভারতীয় সেনাদলেও বিপ্লব আনার চেষ্টা করা হয়।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর মহারাষ্ট্রের একজন নামকরা বীর বিপ্লবী। সাভারকর লণ্ডনে যান। সেখান থেকে গোপনে বোমা তৈরীর নিয়ম ও পিস্তল পাঠাতে থাকেন।

সাভারকর ভাইয়ের নাম গণেশ সাভারকর। দাদার পাঠান পিস্তল দিয়ে তিনি নাসিকের জেলাশাসক জ্যাকসনকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

এই ঘটনার পর লণ্ডনে সাভারকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তাঁকে দীর্ঘ দিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

সাভারকর পরে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন।

বিপ্লবে বাঙালী

বিপ্লবের আগুন বাঙলা দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশের নানা জায়গায় অনেক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গঠন করা হয়।

বাঙলা দেশের প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নাম অনুশীলন সমিতি। সতীশ চন্দ্র বসু অনুশীলন সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির প্রথম সভাপতির নাম—প্রমথ নাথ মিত্র। অনুশীলন সমিতি ছিল—ভগিনী নিবেদিতার আশীর্বাদ ধন্য বিপ্লবী পীঠস্থান।

ঢাকার অনুশীলন সমিতির সংগঠক ছিলেন—পুলিন বিহারী দাস। তিনি একজন নামকরা লাঠিয়াল ছিলেন। সারা দেশে এটির একশো ষোলটি শাখা ছিল। অনুশীলন সমিতির সভ্যরা সরকারী টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লুঠপাট করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করত।

বাঙলার আর একটি বিপ্লবী সমিতির নাম যুগান্তর। কলকাতার মানিকতলার মুরারি পুকুর রোডের একটি বাগানে যুগান্তরের গোপন ঘাঁটি খোলা হয়। অরবিন্দ ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্র নাথ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু, ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্নী) ও আরও অনেকে যুগান্তর দলের সভ্য ছিলেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামও ছিলেন যুগান্তর দলের সভ্য।

কিংসফোর্ড নামে কলকাতায় এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি বিপ্লবীদের কঠোর দণ্ড দিতেন। অনেক সময় তুচ্ছ অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। বিপ্লবীরা তাই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার মতলব করে। এ খবর জানাজানি হয়ে যায়। কিংসফোর্ডকে তাই বিহারের মজঃফরপুরে বদলী করে দেওয়া হয়।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে কিংসফোর্ড হত্যার ভার দেওয়া হল। তাঁরা কিংসফোর্ডের বদলে, ভুল করে দু'জন ইংরেজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করেন। তাঁরা হলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি ; মা ও মেয়ে। প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার আগে আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম বসু সে সুযোগ পেলেন না। তিনি ধরা পড়লেন। বিচারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হল।



ক্ষুদিরাম

প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের কাছে তল্লাসী করে কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। তার ভিত্তিতে পুলিস মুরারি পুকুরে তল্লাসী চালায়। অরবিন্দ সহ চল্লিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদিকে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী করে হাইকোর্টে মামলা আনা হল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন বিপ্লবী পক্ষের ব্যারিস্টার। তাঁর চেষ্টায় অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পান। কিন্তু বাকি বিপ্লবীদের আজীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। অরবিন্দকে অন্য অভিযোগে গ্রেক্তার করার ষড়যন্ত্র চলে। তা জানতে পেরে অরবিন্দ প্রথমে ফরাসী শাসিত চন্দননগরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে পালিয়ে যান, ফরাসী শাসিত পণ্ডিচেরীতে। পরে অরবিন্দ বিপ্লবী ও রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। বাকী জীবন ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকেন। সাধক হিসাবে পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী অরবিন্দ শ্রী অরবিন্দ বা ঋষি অরবিন্দ হয়ে যান। পণ্ডিচেরীতে তিনি অরোভিল নামে এক আশ্রম নগরীর পত্তন করেন।

আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জার্মানী ছিল ইংরেজদের বিপক্ষে। এই সময় কয়েকজন বাঙালী যুবক জার্মানী থেকে গোপনে অস্ত্র এনে বিপ্লব করতে সচেষ্ট হন। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন ছিলেন এই বিপ্লবী যুবক দলের নেতা। সে খবর ইংরাজ সরকার জানতে পেরে জার্মানী জাহাজ আসার পথে বাধা দিয়েছিল। বাঘা যতীন ও অন্যান্য বিপ্লবীরা উড়িষ্যার বুড়িবালাম নদীর তীরে গিয়ে হাজির হয়েছিল। তারা জানত যে অস্ত্র বোঝাই জার্মান জাহাজটি সেখানেই আসবে। সে খবর পেয়ে পুলিস কমিশনার চালর্স টেগার্ট পুলিসবাহিনী নিয়ে তাদিকে বন্দী করতে গেলেন। বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে পুলিসের সামনাসামনি যুদ্ধ হল। আহত অবস্থায় যতীন্দ্রনাথ ও অন্য বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। বন্দী অবস্থায় বাঘা যতীনের মৃত্যু হয়।

বাঙলার আর এক মহান বিপ্লবীর নাম রাসবিহারী বসু। তিনি ইংরেজ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। দেরাদুনে থাকার সময় তিনি বিপ্লবী দলে নাম লেখান। দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। এই ঘটনায় রাসবিহারীকে সন্দেহ করলে, তিনি আত্মগোপন করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য একলক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তিনি ছদ্মবেশে ভারতের নানা জায়গায়

ঘ্নরে ঘ্নরে বিপ্লবী আন্দোলনকে জোরদার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেন। দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৃপাল সিং নামে একজন সৈনিক বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড ধরপাকড় ও অত্যাচার শ্নর্ন করে দেয়। রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপানে চলে যান।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্নর্য সেন। তিনি শিক্ষক ছিলেন বলে সবাই তাঁকে মাষ্টারদা বলত। অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, নির্মল সেন, চার্ন বিকাশ দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদেদার প্রম্নখ বিপ্লবীরা তাঁর দলে যোগ দেন।

আজ থেকে আটান্ন বছর আগের ঘটনা। স্নর্য সেন একদল তর্নণ বিপ্লবী নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, রেলস্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস সব দখল করে নেন। চট্টগ্রামে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সরকার চারদিন বিপ্লবীদের দখলে ছিল। পরে ইংরেজ সেনাদল চট্টগ্রাম শহরে এলে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে বিপ্লবীদলের ভীষণ য্নদ্ধ হয়। এই য্নদ্ধে এগারজন বিপ্লবী ও চৌষট্টিজন ইংরেজ সেনা মারা পড়ে। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রম্নখ বিপ্লবীরা আহত হন ও ধরা পড়েন। কয়েক বৎসর পর স্নর্য সেন ধরা পড়েন ও তাঁর ফাঁসি হয়।

মেদিনীপ্নরেও বিপ্লবী আন্দোলনের আগ্নন জ্বলে ওঠে। মেদিনীপ্নরে বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স নামক বিপ্লবীদলের ঘাঁটি ছিল। এই দলের তর্নণ বিপ্লবীরা পেডি, বার্জ ও ডগলাস প্রম্নখ ম্যাজিষ্ট্রেটদের গ্নলি করে হত্যা করেন। কলকাতার বিনয় বাদল দীনেশ বা বি-বা-দী বাগের নাম কে-না জানে। বিনয় বাদল দীনেশ ছিলেন তিনজন তর্নণ বিপ্লবী। বিনয় ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। ঢাকার প্নলিস স্নপারিনটেনডেন্ট লোমানকে তিনি হত্যা করেন। বিনয় (বস্ন) ও তাঁর অপর দ্নই সহযোগী বাদল (গ্নপ্ত) ও দীনেশ (গ্নপ্ত) কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান করেন। তাঁদের গ্নলি চালনায় কারা বিভাগের অধ্যক্ষ সিম্পসন

নিহত হন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আতঙ্কের সাড়া পড়ে যায়। যে যার প্রাণ বাঁচাতে ছোটাছুটি করতে থাকে। এমন সময় পুলিস কমিশনার টেগার্ট একদল সশস্ত্র পুলিস নিয়ে সেখানে হাজির হন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের অলিন্দের থামের আড়াল থেকে, তিন তরুণ বিপ্লবী পুলিসকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকেন। গুলি ফুরিয়ে গেলে বাদল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। বিনয় নিজেই নিজের মাথায় গুলি চালান। কিন্তু তাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেল হাসপাতালে পাঠায়। দীনেশকে পাঠান হল জেল হাজতে। বিনয় মাথার ঘায়ের ভিতর আঙ্গুল চালিয়ে ঘাকে বিষাক্ত করে তোলেন। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীনেশকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের এই অভিযানকে ইতিহাসে অলিন্দ যুদ্ধ বলা হয়। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনের পুকুর সহ মাঠটির নাম দেওয়া



বিনয় বাদল দীনেশ

হয়েছে বি-বা-দী বাগ (তিন তরুণ বিপ্লবীর নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই নামকরণ হয়েছে)। বি-বা-দী বাগে তিন তরুণ বিপ্লবীর প্রতিমূর্তি আছে।

এবার বাঙলার মহিলা বিপ্লবীদের কথা বলা যাক। প্রীতিলতার কথা আগেই বলা হয়েছে। এই কুমারী বিপ্লবী, সদলে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ইহা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরের ঘটনা।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী ছিলেন নামকরা মহিলা বিপ্লবী। কুমিল্লার অত্যাচারী জেলাশাসক স্টিভেনসকে তাঁরা গুলি করে হত্যা করেন। গভর্ণর এন্ডারসন ভবানী ভট্টাচার্যের গুলিতে নিহত হন। বীণা দাশগুপ্ত গভর্ণর জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। কিন্তু গুলি তাঁর গায়ে না লাগায় প্রাণে বেঁচে যান।

এবার পাঞ্জাবের সশস্ত্র বিপ্লব ও বিপ্লবীদের কথা বলা যাক। এক বাঙালী যুবক পাঞ্জাবে প্রথম গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিং প্রমুখ অনেকের এই সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বিপ্লবীদের উস্‌কানি দেওয়ার অভিযোগে লালা লাজপৎ রায় ও অজিত সিংহকে নির্বাসনে পাঠান হয়। রাসবিহারী বসুও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদলে যোগ দেন। আমেরিকা প্রবাসী পাঞ্জাবী যুবকেরা গদর পার্টি নামে একটি বিপ্লবী সমিতি গঠন করেন।

পাঞ্জাবের আর এক মহান বিপ্লবীর নাম ভগৎ সিংহ। তিনি লালা লাজপৎ রায়ের শিষ্য ছিলেন। লালা লাজপৎ রায় পুলিসের লাঠির আঘাতে আহত ও নিহত হন। তার প্রতিশোধ নিতে সান্ডার্সকে হত্যা করেন তিনি। বিচারে ভগৎ সিংহ, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়। রাজগুরু ও শুকদেব ছিলেন ভগৎ সিংহের সহযোগী। সশস্ত্র বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদ দিয়ে বিদেশী শাসকদের দেশ থেকে হটান যায়নি। কিন্তু তাঁদের রক্তদান ব্যর্থ হয়নি। দেশমাতার বন্ধন মোচনে তারা রক্ত তর্পণ করেছিলেন। তাঁদের এই কাজ দেশের যুবশক্তিকে দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। জনসাধারণকে বিদেশী শাসনের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে এইসব বীর শহীদদের অবদান তাই আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

আত্মার সারথি কংগ্রেস

সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনকে গ্রাম-গঞ্জের কুটিরে কুটিরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। আপামর জনসাধারণকে সশস্ত্র বিপ্লবে সামিল করা সম্ভব

ছিল না। দেশের বেশীর ভাগ লোক তাই সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি উদাসীন ছিল।

কংগ্রেসই দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী, শ্রমিক ভারতবাসী সকলকে বিদেশী শাসনের প্রতি সরব করে তোলে। স্বাধীনতা কাকে বলে? কেন আমরা স্বাধীন হতে চাই? তার উপায় কি? সে বিষয়ে জনসাধারণের ভূমিকা কি? এসব বিষয়ে সচেতন করে তোলে। কংগ্রেসকে তাই নবভারতের আত্মার সারথি বলা হয়।

স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেস অহিংস আন্দোলন শুরু করে। বিদেশী সরকারের সঙ্গে সব বিষয়ে অসহযোগিতা করার জন্য, দেশের জনসাধারণকে ডাক দেয়। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিদেশী সরকারের বিরোধিতা করে। আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য বিদেশী সরকার অনেক অপচেষ্টাও করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশী সরকার দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের নেতারা নবভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদেশী শাসকের অপচেষ্টায় দেশকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করা হল। দেশ ভাগ হয়ে গেল। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান নামে দুটি নতুন দেশের সৃষ্টি হল। কান্না-হাসির রঙ মেশান সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের গল্পকথা বড়ই মধুর ও রোমাঞ্চকর।

অহিংস আন্দোলনের গোড়াপত্তন

ভাবতেও অবাক লাগে—অহিংস আন্দোলনের পথের কথা বাতলে দিয়েছিলেন একজন বিদেশী শাসক। তাঁর নাম অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতজোড়া সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানর চক্রান্ত চলছিল। তিনি তা বুঝতে পারেন। তিনি এই ইংরেজ বিরোধিতার মোড় ঘুরিয়ে দিতে চান।

তিনি একটি রাজনৈতিক সংগঠন তৈরী করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কাগজে একটি খোলা চিঠি লিখে—তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা সকলকে

জানালেন। সকলকে আহ্বান জানালেন—একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সভা গঠনের জন্য।

দেশের বুদ্ধিজীবী লোকেরা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিল। তখনকার বড়লাট (গভর্ণর জেনারেল) লর্ড ডাফরিন তাঁকে সমর্থন করলেন। ডাফরিনের উৎসাহে হিউম সেই সভার অধিবেশন আহ্বান করলেন। সে আজ থেকে একশো তিন বছর আগের ঘটনা।



উমেশচন্দ্র

এই সভার নাম দেওয়া হয়েছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় মহাসভা।

আঠারশো পঁচাশি সালের পঁচিশে ডিসেম্বর। বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লিউ. সি. বনারজী)।

প্রত্যেক বছর দেশের নানা শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসত। অধিবেশনে দেশের সমস্যার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা আলোচনা করা হত। সরকারের কাছে তার প্রতিকার চেয়ে আবেদন করা হত। ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে কংগ্রেস তখন এ দাবী করত না। তারা দেশের শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা চাইত। এরই নাম স্বায়ত্ত-শাসন। তাছাড়া তারা সরকারী চাকরিতে ভারতবাসীর আরও বেশী সুযোগ দেওয়ার কথা জানাত। চাষীদের চাষবাসের সুব্যবস্থার কথা বলত।

কিন্তু দিনে দিনে অবস্থা পালটে গেল। কংগ্রেসের দাবী একটু

একটু করে বাড়তে লাগল। কংগ্রেস বিদেশী সরকারের কাজকর্মের প্রতিবাদ শুরু করে দিল।

ইংরেজ সরকার প্রথম দিকে কংগ্রেসকে ভাল চোখে দেখত। কিন্তু ক্রমশঃ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ ঘটতে থাকল। বিদেশী সরকার কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য করতে শুরু করল। কংগ্রেসের সদস্যরা তখন দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক দল বলল—এভাবে আবেদন নিবেদন করে কোন লাভ নেই। আন্দোলনকে আরও জোরাল করতে হবে। আন্দোলনকে এমন পথে চালাতে হবে যাতে বিদেশী সরকারের টনক নড়ে। কংগ্রেসের এই দলের নাম হল চরম পন্থী। যাঁরা অতটা কড়াকড়ির বিপক্ষে সে দলের নাম হল নরম পন্থী।

নরম পন্থী দলের দাপটই ছিল বেশী। তাদের চাপে পড়ে কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করলেন ভারতবাসীকে স্বরাজ দিতে হবে।

বাঙলা দেশ তখন ছিল কংগ্রেসের কেন্দ্র। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে তখন কংগ্রেসের কাজ চলত। তখন পর্যন্ত বাঙলা প্রদেশটি বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার জেলাগুলি নিয়ে গঠিত ছিল। বাঙলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনও ধীরে ধীরে জোরদার হয়ে উঠছিল। ইংরেজ সরকার তাই কংগ্রেস ও বাঙালীকে দুর্বল করার জন্য এক কৌশল আঁটলেন। সেই কৌশলের নাম বঙ্গভঙ্গ। লর্ড কার্জন তখন ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট। তাঁর আদেশে বাঙলা প্রদেশকে দুভাগে ভাগ করা হল। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বাঙলা প্রদেশ গঠিত হল। পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আসামকে জুড়ে দিয়ে গঠিত হল—পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ। সে উনিশশো পাঁচ সালের ঘটনা।

কার্জন কংগ্রেসকে দুর্বল করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বাঙালীর মনোবল ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু তার উলটো ঘটনা ঘটল। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙালীরা ইংরেজ সরকারের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। কংগ্রেসের ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই যে আন্দোলন, তা স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন নামে পরিচিত।

রাখীবন্ধন

উনিশশো পাঁচ খৃষ্টাব্দের পাঁচই অক্টোবর। সরকারী নির্দেশে ঐদিন বাঙলা দেশকে ভেঙ্গে দু টুকরো করা হল।

বাঙলার জনসাধারণ, এ বেদনা, এ অপমান নীরবে সহ্য করেনি। দিনটি ছিল প্রত্যেক বাঙালীর কাছে শোকের দিন। দিনটিকে বাঙালীরা শোকদিবস হিসেবে পালন করেছিল।

ঐদিন কোন বাঙালীর ঘরে রান্না হয়নি। সবাই সারা দিন উপবাসে দিন কাটায়।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঐদিন রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। হিন্দু মুসলমান সবাই পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছে।



রবীন্দ্রনাথ

রাখীবন্ধন উৎসবে কলকাতা সেদিন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। রাখীবন্ধন মিছিলের নেতা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ একটি গান বেঁধেছিলেন—"বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, বাঙলার হাওয়া, বাঙলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।"

এই গান শুনে সকলের মন সেদিন আবেগে ভরে উঠেছিল।

গানটির শেষ স্তবক এইরূপ—"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন, এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান''।

বঙ্গভঙ্গ, হিন্দু মুসলমান সকলকে সেদিন "এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'' কাকে বলে তা শিখিয়েছিল।

রাখীবন্ধন সকলকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেরণা দান করে। সকলের

মুখে প্রতিবাদের ভাষা যোগায়। সকলে তাই একযোগে বঙ্গভঙ্গ রদ করার শপথ গ্রহণ করেন।

জাতির ইতিহাসে রাখীবন্ধন তাই একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। বাঙলার সকল শ্রেণীর মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। একটি হল বিদেশের তৈরী জিনিস বর্জন বা বয়কট করা। অন্যটি হল দেশের কলকারখানার ও কারিগরদের তৈরী জিনিস ব্যবহার করা। এই আন্দোলনকে তাই স্বদেশী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলন বলা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল, লিয়াকৎ হোসেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ নেতারা এই আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ইংরেজ বণিকেরা ইংল্যাণ্ডের কলকারখানায় তৈরী জিনিসপত্র ভারতে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করত। তারা নানাভাবে দেশের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছিল। ইংল্যাণ্ডের তৈরী জিনিসপত্র দেখতে যেমন সুন্দর, দামও তেমনি কম ছিল। তাছাড়া বিলিতি জিনিস ব্যবহার করার একটা গর্ব ছিল। লোকে তাই দেশের জিনিস ফেলে বিদেশী জিনিস কিনত।

ইংরেজ সরকারকে জব্দ করার জন্য দেশের নেতারা বিদেশী জিনিস বর্জন বা বয়কট করার ডাক দিলেন। ইংরেজের তৈরী স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান হল। বিদেশী জিনিস বর্জন করলে, ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হবে। তখন তারা দেশবাসীর দাবী মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই ধারণা নিয়েই বিদেশী জিনিস বর্জন বা বয়কটের ডাক দেওয়া হয়।

কিন্তু বিদেশী জিনিস বর্জন করলেই তো চলবে না। সব বর্জন

করলে লোকের দিন চলবে কি করে। তাই বিদেশী জিনিসের বদলে দেশেই সেসব জিনিস তৈরী করা চাই। সেগুলি দেখতে যত খারাপ হক বা দাম বেশী হক দেশের লোককে তা কিনতে হবে। তাতে দেশীয় শিল্প গড়ে উঠবে ; দেশের শিল্পীরা বাঁচবে। এই ধারণা নিয়ে স্বদেশী জিনিস উৎপাদন ও ব্যবহার করার জন্য আন্দোলন চালান হয়েছিল।

স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সেদিন কত কবি কত গান বেঁধে ছিলেন। যেমন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মানে দেশের তাঁতীদের তাঁতে বোনা কাপড়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বিলাতী জিনিস বর্জনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক গান লেখা হয়। যেমন—

"পর না কাঁচের চুড়ি, বঙ্গনারী
আর পর না।
জাগো গো ও জননী! ও ভগিনী!
ঘুমের ঘোরে আর থেক না"।

বয়কট আন্দোলনে সেদিন বাঙলার ছাত্রসমাজও ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। তারা বিলাতী জিনিস বর্জনের জন্য দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং বা প্রচার করতে থাকে। বন্দেমাতরম ধ্বনিতে বাতাস ভরে ওঠে। তাদের দমন করার জন্য পুলিস লাঠি চালায়, গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। রাজপথ রক্তে ভেসে যায়। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি বা স্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও তাদিকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনা যায়নি। বঙ্গভঙ্গ রদ করার সঙ্কল্পে সবাই তখন অটল। সবার মুখে তখন এক কথা—

বেত মেরে কি মা ভোলাবি, আমরা কি মার সেই ছেলে।

অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল-কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তাদের শিক্ষাদানের জন্য নতুন স্কুল-কলেজ খোলা হল। এইসব স্কুল-কলেজে লেখাপড়া ছাড়াও জাতীয় ভাবধারায় ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করা হত। এই শিক্ষাকে তাই জাতীয় শিক্ষা বলা হত। জাতীয় শিক্ষা পরিচালনার জন্য জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সাধারণ স্কুল ছাড়াও কারিগরী বিদ্যালয় খোলা হয়। সে সময়ের একটি কারিগরী বিদ্যালয় বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গের পরে

স্বদেশী আন্দোলনের ধরন দেখে ইংরেজ শাসক খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। দমন-পীড়ন চালিয়েও আন্দোলন বন্ধ করা গেল না। বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন। বাঙলা এক হল। অসম একটি আলাদা প্রদেশ হল। বিহার ও ওড়িশাকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করা হল।

বঙ্গভঙ্গ রদ করলেও লর্ড কার্জন কামড় দিতে ছাড়লেন না। ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হল। তাতে বাঙলার ও কলকাতার গুরুত্ব কমে গেল।

বঙ্গভঙ্গ দেশের লোকের কাছে বিদেশী শাসকদের মুখোস খুলে দেয়। দেশের লোক বিদেশী শাসনের কুফল সম্বন্ধে সচেতন হয়। ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে পৃথিবী জুড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক দল। ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ এনে জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করতে চাইত। তাই এই চুক্তির জন্য বিদেশী সরকার খুব ভয় পেয়ে যায়।

এই সময়ে লোকমান্য তিলক হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন।

স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে হোমরুল আন্দোলন শুরু হয়। হোমরুল আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। এই যুদ্ধে ভারতবাসী ইংরেজদের নানাভাবে সাহায্য করে। কথা ছিল ইংরেজরা যুদ্ধে জয়ী হলে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হবে। কিন্তু ভারতবাসীকে পুরোপুরি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হল না।

দেশশাসনের জন্য নতুন আইন তৈরী হল। শাসনব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করা হল। কংগ্রেসের নেতারা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন দিনে দিনে তুমুল হয়ে উঠল। আন্দোলন দমনের জন্য সরকার এক নতুন আইন চালু করলেন। সে আইনের নাম রাওলাট এ্যাক্ট। জনগণের ইংরেজ-বিরোধী কাজকর্ম দমন করার জন্যই এই আইন চালু করা হয়।

রাওলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। ইংরেজ সরকার আন্দোলন দমনের জন্য উৎপীড়ন শুরু করে দিলেন। দমন-নীতির প্রতিবাদে পাঞ্জাবের জালিয়ান ওয়ালাবাগে এক জনসভা আহ্বান করা হয়েছিল। সভার জায়গাটি ছিল চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যাতায়াতের জন্য একটি পথই ছিল খোলা।

সভার কাজ শুরু হওয়ার পর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল। ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল ডায়ার একদল সৈন্য নিয়ে সেখানে এলেন। যাতায়াতের পথে মেসিন গান বসিয়ে নির্মম ভাবে গুলি চালানোর আদেশ দিলেন তিনি। তার ফলে শিশু ও নারী সহ একহাজার লোক নিহত হল।

এই হত্যাকণ্ডের ফলে দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। কবি রবীন্দ্রনাথ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করেন। তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া স্যার উপাধি বর্জন করলেন। তখন চেমসফোর্ড ছিলেন ভারতের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট। প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি চেমসফোর্ডকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

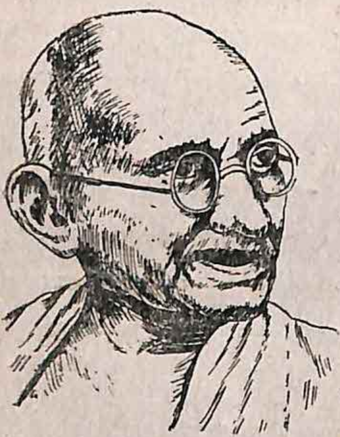
বিদেশী সরকার ভেবেছিলেন, দমন-পীড়ন চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দোলনের নেতাদের মনে তখন দেশ-প্রেমের জোয়ার। তাদের মনের অবস্থা তখন ঠিক এইরকম—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুট্‌বে তত টুট্‌বে।

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা

ইংরেজ সরকার রাওলাট আইন বাতিল করলেন না। কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। কংগ্রেস থেকে মহাত্মা গান্ধীকে এই আন্দোলন পরিচালনার ভার দেওয়া হল।

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার, একজন আইনজীবী। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্টারি করতেন।



মহাত্মা গান্ধী

দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ইংরেজদের রাজত্ব ছিল। সেখানে অনেক ভারতীয় বাস করত। তাদের কেউ-বা ব্যবসা করত, কেউ-বা চাকরি করত, কেউ-বা কলকারখানা, বাগ-বাগিচায় কুলির কাজ করত।

ইংরেজ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। ট্রেনের এক কামরায় কোন ইংরেজের সঙ্গে কোন ভারতীয় যাতায়াত করতে পারত না। ইংরেজদের হোটেলে কোন ভারতীয় ঢুকতে পারত না। আরও নানারকম দুর্দশা ভারতীয়দের ভোগ করতে

হত। দক্ষিণ আফ্রিকায় সব ভারতীয়কেই কুলি বলা হত। গান্ধীজীকে কুলি ব্যারিস্টার বলে ডাকা হত।

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকাতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। অহিংস উপায়ে সে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তিনি। সে আন্দোলনের নাম ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। আন্দোলনের ফলে ভারতীয়রা সেখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। সারা পৃথিবীতে গান্ধীজীর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

গান্ধীজী কংগ্রেসের আন্দোলনকে এক নতুন রূপ দান করলেন। সে আন্দোলনের নাম দেওয়া হল—অসহযোগ আন্দোলন। সব ব্যাপারে অসহযোগিতা করে বিদেশী শাসককে বিপাকে ফেলাই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। আন্দোলনকে সফল করার জন্য কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হল। গান্ধীজী ভারতবাসীর সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন—

সরকারী স্কুল কলেজ বর্জন কর।
আইনসভার সদস্য পদ ত্যাগ কর।
সরকারী খেতাব বর্জন কর।
দরবার অনুষ্ঠানে যাওয়া ছেড়ে দাও।
বিদেশী-জিনিস ব্যবহার কর না।
সরকারী চাকরি ছেড়ে দাও।
সরকারী খাজনা দিও না।

তখন ইংরেজের তৈরী মিলের কাপড়ে দেশের বাজার ছেড়ে গিয়েছিল। গান্ধীজী চরখায় সুতো কেটে নিজেদের কাপড় নিজেদিকে তৈরী করে নিতে বললেন। ঘরে ঘরে চরখায় সুতো কাটা শুরু হল। কবি সকলকে উৎসাহ দিতে লিখলেন—

চরখার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর,
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর।
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,
দাড়া আপনার পায়ে দাড়া।

চৌরিচৌরায় কাহিনী

গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যের পথে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি সকলকে কোন হিংসাত্মক কাজ না করার উপদেশ দেন।

অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারত উত্তাল হয়ে উঠল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য লোক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

এ সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতে আসেন। তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে সারা দেশে হরতালের (ধর্মঘট) ডাক দেওয়া হয়েছিল। হরতাল সফল হয়েছিল। যুবরাজের যাতায়াতের সময় পথে-ঘাটে একটি লোকও দেখা যায়নি।

এই উপলক্ষে বোম্বাইয়ে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যুবকদের সঙ্গে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবীদের হাঙ্গামা বাধে, পুলিস গুলি চালায়। পুলিসের গুলিতে ৫৩ জন স্বেচ্ছাসেবক মারা যান।

স্বেচ্ছাসেবীদের ধরে ধরে পুলিস জেলে ভরতে থাকে। জেলে জায়গা না থাকায় পুলিস বেদম লাঠি চালিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাগল। এই আন্দোলনে সারা ভারতে তিরিশ হাজার ভারতবাসী কারাবরণ করেন।

আন্দোলন দিনে দিনে জোরদার হয়ে উঠছিল। আন্দোলনের ধরন দেখে ইংরেজ সরকার ভয় পেয়ে গেলেন। ঠিক এ সময়ে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল।

উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরায় জনতার উপর পুলিস বর্বর অত্যাচার চালায়। অত্যাচারে খেপে গিয়ে জনতা অহিংসার শপথের কথা ভুলে গেল। তারা চৌরিচৌরা থানা দখল করে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। বেশ কয়েকজন পুলিস কর্মচারী আগুনে পুড়ে মারা গেল।

এ ঘটনায় গান্ধীজী খুবই ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন তিনি।

হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় অনেকেই বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন। গান্ধীজীর সঙ্গে অনেক নেতার মতান্তর ঘটল। বিঠল ভাই প্যাটেল, মোতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মোতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে এলেন। তারা একটি নতুন দল গঠন করলেন। সে দলের নাম স্বরাজ্য দল। দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য। পরে স্বরাজ্য দল ভেঙ্গে যায়। ঐ দলের সদস্যরা কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

আইন অমান্য আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। গান্ধীজী কংগ্রেসের কর্মীদের বললেন তোমরা গ্রামে ফিরে যাও। গ্রাম ও গ্রামবাসীর উন্নতির জন্য কাজ শুরু করে দাও।

এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। কংগ্রেস থেকে শাসন-সংস্কারের জন্য ইংরেজ সরকারকে চাপ দেওয়া হতে থাকল। শাসন-সংস্কারের জন্য ইংরেজ সরকার একটি কমিশন গঠন করলেন। কমিশনের নেতা ছিলেন স্যার জন সাইমন। এই কমিশনের নাম তাই সাইমন কমিশন।

কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না। কংগ্রেস তাই সাইমন কমিশন বয়কট করার ডাক দিল। দেশের লোক আবার জেগে উঠল।

এ সময়ে দেশে দারুণ মন্দা চলছিল। দুর্ভিক্ষ, খরা ও বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয়। চাষীদের দুঃখ-দুর্দশার শেষ ছিল না; কিন্তু তাদের খাজনা মকুব করা হয়নি।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ছিলেন একজন জননেতা। খাজনা দেওয়া বন্ধ করার জন্য তিনি কৃষকদের সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন। বারদোলীরা কৃষকরা সত্যাগ্রহ করেছিল। তাদের খাজনা মকুব করা হল। এই আন্দোলনের দেখাদেখি দেশের নানা জায়গায় কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠল। সুভাষচন্দ্র কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে দিলেন। বিদেশী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তাদিকে আহ্বান জানালেন।

বিদেশী সরকার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে বিচলিত হয়ে উঠলেন। আন্দোলন দমন করার জন্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু হল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হল। বিদেশী সরকারের সমর্থনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুবিধা দাবী করলেন। কংগ্রেসে ভাঙন ধরার উপক্রম ঘটল।

ইংরেজ সরকারের দমন-নীতিতে দেশের যুবশক্তি অশান্ত অস্থির হয়ে উঠল। দেশের নানা জায়গায় সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। বিপ্লবীদের গুলি ও বোমার আঘাতে অনেক ইংরেজ সরকারী কর্মচারী প্রাণ হারালেন। অনেক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হল বা নির্বাসনে পাঠান হল। দেশ জুড়ে অস্থিরতা ও অশান্তির ঝড় বইতে লাগল।

গান্ধীজী এতদিন কারাগারে ছিলেন। উনিশশো আঠাশ সালে তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন। উনিশশো ঊনত্রিশ সালে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। অশান্ত দেশবাসীকে শান্ত করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গ্রহণ করা হল। এই দাবী আদায়ের আন্দোলনের দায়িত্ব দেওয়া হল মহাত্মা গান্ধীকে। গান্ধীজী এক নতুন পথে আন্দোলন গড়ে তুললেন। সে পথ আইন না-মানা বা আইন অমান্য করার পথ। ইতিহাসে এই আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন নামে পরিচিত।

লবণ আইন অমান্য করে, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। ধনী, দরিদ্র, রাজা, ভিখারী সকলেরই দু বেলা নুনের দরকার। গরীব লোকেরা সাগরের জল ফুটিয়ে নুন তৈরী করে নিত। ইংরেজ সরকার আইন করে নুন তৈরী করা বন্ধ করে দিয়েছিল। ইংরেজ বণিকেরা বিলেত থেকে ভারতে নুন আমদানি করত। ভারতবাসীকে বেশী দাম দিয়ে সকলকে কিনতে হত।

ইংরেজ সরকারের শোষণ-নীতির এই বীভৎস চেহারাটা গান্ধীজী সবাইকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রথমে লবণ আইন

অমান্য করেছিলেন। যে সরকার, জল ফুটিয়ে গরীব লোককে নুন তৈরী করতে দেয় না—সে সরকারকে দেশ থেকে হটান দরকার। এটাই গান্ধীজী গরীব ভারতবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন ভারতের অগণিত খেটে-খাওয়া মানুষ এমনকি পথের ভিখারীকেও এই নির্মম সত্যটুকু বোঝাতে, তাদের সমর্থন পেতে। তিনি তা পেরেছিলেন। আইন অমান্য করার আগে তিনি বিদেশী সরকারকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন—"মেরে এক কদমসে সারা হিন্দুস্তান ওথাল পাথাল হো যায়েগা" [আমি এক পা ফেললে সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠবে]।

বিদেশী সরকার গান্ধীজীর এ কথাকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলা করেছিলেন। কিন্তু তাদের ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। উনিশশো তিরিশ সালের তেরই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে বের হলেন। সঙ্গে ঊনআশি জন সত্যাগ্রহী। পায়ে হেঁটে তিনি পৌঁছালেন ডাণ্ডীতে, গুজরাটের সমুদ্রতীরে একটি গ্রামে। দুশো একচল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে তাঁর চোদ্দ দিন সময় লেগেছিল। ইতিহাসে গান্ধীজীর এই পদযাত্রাকে ডাণ্ডি অভিযান বলা হয়। সেখানে তিনি সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করে ভঙ্গ করলেন লবণ আইন।

আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে সারা দেশে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। দলে দলে লোকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। মেদিনীপুরের কাঁথি ও চব্বিশ পরগনার মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়। ভারতের নারী-সমাজও এই আন্দোলনে যোগ দেয়; হাসিমুখে কারাবরণ করে।

শুধু লবণ আইন নয়; অন্যান্য ক্ষতিকর আইনও ভঙ্গ করা হয়েছিল। যেমন—নিষিদ্ধ রাজনৈতিক বই খোলাখুলি বিক্রি করা শুরু হল। একশো চুয়াল্লিশ ধারা অমান্য করে সভা-সমিতি ডাকা হল। স্কুল, কলেজ, আদালত ও মদের দোকানে পিকেটিং করা (না যাওয়ার জন্য দল বেঁধে প্রচার) শুরু হল। সারা দেশে আন্দোলন ব্যাপক রূপ ধারণ করে। আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার সেনাবাহিনী নিয়োগ করেন। প্রায়

একলক্ষ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়। পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে কত সত্যাগ্রহী অকালে মৃত্যুবরণ করে। তবুও আন্দোলনের গতিকে থামান গেল না। বিদেশী সরকার তখন মরিয়া হয়ে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দিলেন। সত্যাগ্রহীদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। একজন সত্যাগ্রহীকে খুঁজে বের করতে গাঁয়ের সব লোকের উপর পিটুনি কর বসান হত। আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সারা ভারতে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল। আন্দোলনের ছোট-বড় সব নেতাকে জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাতেও বিদেশী সরকার আন্দোলন বন্ধ করতে পারেননি।

এই সময় ভারতের শাসন-সংস্কার করার জন্য ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে এক বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকের নাম গোলটেবিল বৈঠক। সরকারের দমন-নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ঐ বৈঠক বর্জন করে। বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়নি। বাধ্য হয়ে সরকার বিনাসর্তে গান্ধীজীকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন। সত্যাগ্রহীদের উপর দমন-পীড়ন বন্ধ করা ও বন্দীদের মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। এ ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে গান্ধীজীর এক চুক্তি হল। সে চুক্তির নাম গান্ধী-আরউইন চুক্তি।

গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লণ্ডনে গেলেন গান্ধীজী। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকেও সমস্যার সমাধান হল না। গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন।

গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন। আবার আইন অমান্য করার জন্য দেশবাসীকে ডাক দিলেন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। সরকারের দমন-নীতিও বীভৎস ও ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীসহ একলক্ষ কুড়ি হাজার সত্যাগ্রহী কারাবরণ করলেন। লর্ড উইলিংডন তখন ভারতের বড়লাট। দমন-নীতির প্রয়োগে কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলেন তিনি। অত্যাচারের হাত থেকে নারী সত্যাগ্রহীরাও রক্ষা পায়নি।

জেলের ভেতরেই গান্ধীজী এই নিদারুণ অত্যাচার উৎপীড়নের খবর

পান। গান্ধীজী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ জানালেন। জেলে তিনি অনশন শুরু করে দিলেন। একুশ দিন অনশনে কাটানোর পর তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল।

এবার শুরু হল কংগ্রেসের নেতাদের একক বা একা একা আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী একক আন্দোলন শুরু করলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হল। গান্ধীজীর পর বিনোবা ভাবে প্রমুখ অনেক নেতা একক আন্দোলনে ব্রতী হন ও কারাবরণ করেন।

অবশেষে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। সরকারী দমন-পীড়নে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। দমন-নীতির চাপে জনতা হিংসার পথ নিতে পারত। তাতে ফল আরও খারাপ হত। সেই ভয়েই গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তবে আন্দোলন একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আইন অমান্য আন্দোলন ছিল জনতার অগ্নি পরীক্ষা। আইন অমান্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতাই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পথকে সুগম করেছিল।

ভারত শাসন আইন

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে উপদ্রব করলে, বড়রা তাদের হাতে চুষিকাঠি দিয়ে ভোলায়। ইংরেজ সরকার শেষে ভারতবাসীর হাতে চুষিকাঠি তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তার ফলে বিলাতের পার্লামেণ্টে (জন-প্রতিনিধি সভা) এক নতুন আইন তৈরী হল। সে আইনের নাম ভারত শাসন আইন। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত শাসন আইন চালু করা হয়।

এই আইনে ভারতকে এগারটি প্রদেশে ভাগ করা হয়। দেশীয় রাজ্য ও প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হল।

ঠিক হল, গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাট হবেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার।

জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত করবেন। এই প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে।

দরকারী বিভাগগুলির কাজ গভর্ণর জেনারেল নিজে দেখবেন। বাকী বিভাগগুলির কাজ এক একজন মন্ত্রী দেখাশোনা করবেন।

মুসলমান ও অনুন্নত জাতির লোকেদের জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করলে আইনসভার পরামর্শ না নিয়েই মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

দেশীয় রাজ্য শাসনের ভার সেখানকার রাজা ও নবাবদের হাতেই থাকল।

প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার কথা বলা হল। ঠিক হল—প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভা থাকবে। জনগণের ভোটে আইনসভার সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। তাদের নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হবে। আইনসভার সদস্যদের ভিতর থেকে (যে দলের সদস্য সংখ্যা বেশী)। কয়েকজনকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ বিভাগুলি গভর্ণর নিজে পরিচালনা করবেন। বাকি বিভাগগুলি এক একজন মন্ত্রী পরিচালনা করবেন।

গভর্ণর ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। প্রদেশগুলিতে মুসলমান ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য আলাদা নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

দেশবাসীকে বঞ্চিত না করে কিঞ্চিৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল—ভারত শাসন আইনে। জনগণের প্রতিনিধিরা কোন কোন বিষয়ে আইন করার অধিকার পেল। মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেল।

সেনাবাহিনী, বিদেশ দপ্তর, রেল-ডাক-তার, অর্থ এসব দরকারী বিভাগগুলির দায়িত্ব বিদেশী সরকার নিজের হাতেই রেখে দিলেন।

নানা কারণে দু'বছর ভারত শাসন আইন কার্যকরী করা যায়নি।

উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে এই আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন হল। নির্বাচনে কংগ্রেস এগারটি প্রদেশে জয়লাভ করে। ঐসব প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

বাঙলাদেশে ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ জয়লাভ করে।

বিহার ও যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের সুপারিশ করে। গভর্ণর তা অগ্রাহ্য করেন। ফলে ঐ দুই প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে।

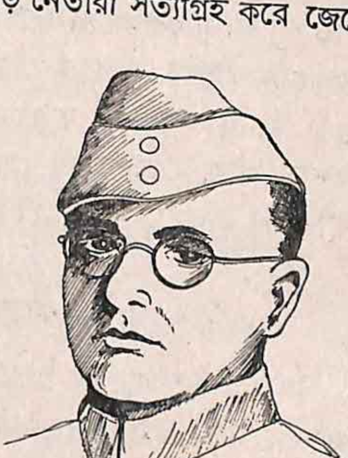
উনিশশো ঊনত্রিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করা হল। কিন্তু সে বিষয়ে মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করা হল না। তাই সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। ইংরেজরা এই যুদ্ধে যোগ দেয়। বিদেশী শাসক ভারতকেও যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে।

কংগ্রেস এই ঘোষণা ভাল মনে গ্রহণ করতে পারেনি। উনিশশো চল্লিশ সালে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করল। বিনোবা ভাবে, জহরলাল, বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ বড় বড় নেতারা সত্যাগ্রহ করে জেলে গেলেন।

জাপান এই যুদ্ধে ইংরেজদের শত্রুপক্ষ ছিল। জাপান একটার পর একটা যুদ্ধে জয়লাভ করছিল। এ ঘটনায় ইংরেজরা খুব ভয় পেয়ে গেল। তাদের ভয় হল জাপান যে কোনদিন ভারত আক্রমণ করতে পারে।



নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে এক নতুন দল গঠন করেছিলেন। সে দলের নাম ফরোয়ার্ড ব্লক। যুদ্ধের সময় ভারত সরকার সুভাষচন্দ্রকে তাঁর নিজের

বাড়িতে বন্দী করে রাখে। পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে পালিয়ে গেলেন। জার্মানী থেকে ডুবোজাহাজে করে তিনি জাপানে গিয়ে পৌঁছালেন।

জাপানে অনেক বন্দী ভারতীয় সেনা ছিল। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দেশ থেকে পালিয়ে জাপানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন করেছিলেন।

রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। ভারতীয় সেনারা তাঁকে নেতা বলে মেনে নিল। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর কাছে নেতাজী।

নেতাজী সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। কয়েকটি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। শেষে জাপানের পতন ঘটলে আজাদ হিন্দ বাহিনীও আত্মসমর্পণ করে।

নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সহায়তায় দিল্লী দখল করতে চেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর যুবকদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'দিল্লী চলো।' তিনি তাদিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও; আমি তোমাদের স্বাধীনতা দোব।' দিল্লীর লালকেল্লায় তিনি তেরঙা পতাকা ওড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হল না। জনরব—বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। অনেকে তা বিশ্বাস করে, কেউ-বা বিশ্বাস করে না। কিন্তু মৃত্যু হোক বা না-হোক পৃথিবীর ইতিহাসে নেতাজী চির অমর।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকের কথা। জাপানের আক্রমণে বৃটিশ সেনাবাহিনী একটার পর একটা যুদ্ধে পরাজিত। জাপানী সেনা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে। ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুতগতিতে।

এ সময় কলকাতায় জাপানী বিমানবাহিনী বোমা বর্ষণ করেছিল।

বৃটিশ সরকার খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভারতবাসীর সহায়তা না পেলেই নয়। তাই পাঠান হল স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপসকে। স্টাফোর্ড ক্রীপস তখন ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রী।

ক্রীপস কতকগুলি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। বলা হয়েছিল যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হলে ভারতকে ডোমিনিয়ান বলে গণ্য করা হবে। ডোমিনিয়ান কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীনতা নয়। অনেক ব্যাপারে অধীনতা মেনে চলতে হয়।

প্রস্তাবে মুসলিম লিগের পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করা হয়। যে কোন প্রদেশের ভারতে ভেতরে না থাকার অধিকারকেও মেনে নেওয়া হয়। তার মানে ভারতে খণ্ড খণ্ড অনেকগুলি রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত ছিল।

প্রস্তাবে যে কোন বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলের 'ভেটো' (খুশীমত বানচাল করা) দেওয়ার অধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

কংগ্রেস এ প্রস্তাবে সায় দেয়নি। দেশের লোকও বুঝতে পারল ইংরেজ ভারতের স্বাধীনতা দিতে নারাজ।

ওদিকে জাপান তখন ভারতের দিকে এগিয়ে আসছে।

গান্ধীজী বললেন—

ইংরেজ আছে ভারতে তাই
জাপান আসিছে ছুটে।
ভারত ছাড়িয়া গেলে ইংরেজ
বিপদ যাইবে টুটে।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন জাপানের ভয়ে ইংরেজ এখন দিশাহারা। চাপ দিলেই, ভারত ছেড়ে চলে যাবে।

গান্ধীজী তাই আন্দোলনের ডাক দিলেন। সে আন্দোলনের নাম—ভারত ছাড় আন্দোলন। দেশের লোককে ডাক দিয়ে বললেন—এ লড়াই আমাদের শেষ লড়াই। আমরা হয় জয়লাভ করব, না হয় বরণ করব মৃত্যু।

আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই নিষিদ্ধ করা হল কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের করা হল গ্রেপ্তার। দেশবাসী এ ঘটনায় প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল আন্দোলনের ঢেউ। সারা দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। "ইংরেজ ভারত ছাড়" ; আর, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল ভারতের আকাশ বাতাস। কত সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, থানা, ডাকঘর, ধ্বংস হয়ে গেল। সরকারী অফিসে বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন' জ্যাকের বদলে বিপ্লবীরা উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা। আগস্ট মাসে (১৯৪২ সাল) এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ইতিহাসে এই আন্দোলন তাই 'আগস্ট বিপ্লব' নামেও বিখ্যাত।



মাতঙ্গিনী হাজরা

বাঙলা দেশের মেদিনীপুরে আন্দোলন চরমে উঠেছিল। এই সময় পুলিসের গুলিতে মহিলা কংগ্রেস নেত্রী মাতঙ্গিনী হাজরা প্রাণ দান করেন। বিপ্লবীরা মেদিনীপুরের তমলুক, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল এই চারটি থানা দখল করে নেয়। তমলুকে স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সতীশচন্দ্র সামন্ত ও অজয় মুখোপাধ্যায় ছিলেন জাতীয় সরকারের সর্বাধিনায়ক। জাতীয় সরকার প্রায় দু' বছর তমলুক শাসন করে থাকে।

আগস্ট বিপ্লবও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। বড় বড় নেতাদের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাই এ আন্দোলন কতকটা নেতাবিহীন আন্দোলন ছিল।

আন্দোলনের ফলে প্রায় দশহাজার লোক পুলিস ও সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারায়। দমন-নীতির চাপে অনেক জায়গায় জনতা রাগে অধীর হয়ে ওঠে। তারা হিংসার পথ ধরে।

কংগ্রেসী নেতারা হিংসামূলক কাজকর্মের নিন্দা করলেন। হিংসার পথ থেকে আন্দোলনকে সরিয়ে আনতে একুশদিন অনশন করলেন গান্ধীজী।

এই সময় দেশে হঠাৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাঙলাদেশে এই দুর্ভিক্ষ তেরশো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ নামে পরিচিত। দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যায়। তার ফলেও আন্দোলনের গতি কমে আসতে থাকে।

ভারত ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল বটে। কিন্তু এই আন্দোলন বিদেশী শাসনের বজ্রকঠিন ভিতকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়েছিল। ইংরেজ সরকার বুঝতে পেরেছিল আজ না হয় কাল তাদিকে ভারত ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

নৌ-সেনা বিদ্রোহ

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ জয়লাভ করে। এই ঘটনার এক বছরের ভিতরে ভারতের নৌ-সেনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনাদের দিল্লীতে লালকেল্লায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল। লালকেল্লাতেই তাঁদের বিচার হয়েছিল। বিচার চলার সময়ে তাঁদের কীর্তিকাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। দেশের লোক তাঁদের বীরত্ব, তাঁদের দেশপ্রেম, তাঁদের সমর কৌশল, তাঁদের স্বার্থত্যাগের কথা জানতে পারল। তাঁদের নামে দেশ জুড়ে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেই বীরত্ব ও সাহসিকতা, ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনে সাহস যোগায়। সেনাবাহিনীর ইংরেজ অফিসাররা তুচ্ছ কারণে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। যা-তা কথা বলে গালি-গালাজ দিত। ভারতীয় সেনাদের নিকৃষ্ট খাবার খেতে দেওয়া হত। আবেদন-নিবেদন করেও কোন লাভ হত না।

ভারতীয় সেনাবাহিনীরা রাগে ফুঁসছিল। এতদিন সাহসের অভাবে

তারা কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর আদর্শকে সামনে রেখে এবার ভারতীয় নৌ-সেনারা বিদ্রোহ করল।

উনিশশো ছে'চল্লিশ সালের দশই ফেব্রুয়ারী। বোম্বাইয়ে, 'তলওয়ার' জাহাজের নাবিক সেনারা, বিদ্রোহ করল। জাহাজে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক তোলা ছিল। তার বদলে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল। রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর নাম বদলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি হল। সবাই "ইংরাজ ভারত ছাড়" জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

বিদ্রোহের আগুন কলকাতা, মাদ্রাজ ও করাচী বন্দরে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী নৌ-সেনাদিগকে গুলি করার আদেশ দেওয়া হল। ভারতীয় সেনারা সে আদেশ পালন করল না। ইংরেজ সেনারা গুলি চালালে তারাও পাল্টা গুলি চালাল। বিদ্রোহী সেনারা কয়েকটি জাহাজ ও নৌবাহিনীর অস্ত্রাগার দখল করে নিয়েছিল।

জনতার ভিতরে প্রবল উল্লাস ও উত্তেজনা দেখা দিল। বোম্বাইয়ে হরতাল (ধর্মঘট) হল। রাস্তায় রাস্তায় জনতার সঙ্গে পুলিসের খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। ভারত সরকার বোম্বাই শহরে বোমাবর্ষণের হুমকি দিল। কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করল।

এ বিদ্রোহ ভারত সরকারের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিদ্রোহী সেনাদের তাই শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

নৌ-বিদ্রোহ বিদেশী শাসকদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা বুঝেছিল শেষ ঘন্টা বাজার সময় এসে গেছে। তাদিকে এবার ভারত ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা

নৌ বিদ্রোহের ঘটনায় বিদেশী সরকার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সমঝোতার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে পাঠান হল। তাদের নাম স্যার পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও এ. ভি.

আলেকজাণ্ডার। এই তিনজনের মিশনের (দল) নাম ক্যাবিনেট মিশন।

কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সব প্রস্তাব মেনে নেয়নি। মুসলিম লীগ অনেক দিন থেকে পাকিস্তানের (মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র) দাবী করে আসছিল। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে পাকিস্তান গঠনের ইঙ্গিত ছিল। মুসলিম লীগের নেতা ছিলেন জিন্না। জিন্না ক্যাবেনিট মিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন।



জিন্না

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল জনগণ কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। গণপরিষদ একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করবে। সেই শাসনতন্ত্রের বিধান মেনে স্বাধীন ভারতের শাসন কাজ চলবে।

গণপরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন হল। নির্বাচনে কংগ্রেস বেশী আসন পেল। মুসলিম লীগ অনেক কম আসন পেল।

এই ঘটনায় মুসলিম লীগ দিশাহারা হয়ে পড়ল। তারা বুঝতে পেরেছিল—তাদের পাকিস্তান গঠনের আশা পূর্ণ হবে না। তারা তাই ফন্দি আঁটতে লাগল।

মুসলিম লীগের পিছনে বিদেশী সরকারের উস্কানি ছিল। সেই সাহসে মুসলিম লীগ ঘোষণা করল লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। মুসলিম লীগের মিটিংয়ে (১৯৪৬ সাল ২৭শে জুলাই) ঠিক হল তারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (সরাসরি লড়াই) করে পাকিস্তান আদায় করে নেবে।

ষোলই আগস্ট সরাসরি লড়াই শুরু হয়ে গেল। মুসলিম লীগের সমর্থকরা ঐদিন কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাল। হিন্দুদের খুন ও

লুঠতরাজ করতে লাগল। হিন্দুরাও পাল্টা শোধ নিল। দিনে দিনে, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেল। সে কি রক্ত গঙ্গা ; সে কি বিভীষিকা!

বৃটিশ সরকার ইচ্ছা করলে, আগেই ব্যবস্থা নিতে পারত। তাহলে দাঙ্গা ঘটত না। ইচ্ছা করলে, দাঙ্গা শুরু হওয়া বন্ধ করে দিতে পারত। ইচ্ছা করলে অন্য রাজ্যে দাঙ্গা ছড়াতে দিত না।

কিন্তু কিছুই করেনি। যেটুকু করেছিল তা লোক-দেখানি।

বিদেশী সরকার চাইছিল ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে, দেশটাকে দু' টুকরো করে দিতে। মুসলিম লিগকে হাত করে, সে তার একটা ধাপ তৈরী করল।

সবাই বুঝল, আর উপায় নেই মুসলিম লিগের দাবী মানতেই হবেই। পাকিস্তান হবেই। ভারত বিভাগ ঠেকানো যাবে না।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা জাতির কলঙ্ক। জাতির জীবনে এক নিদারুণ অভিশাপ। সে অভিশাপের বোঝা জাতি আজও বয়ে চলেছে।

ওরে নতুন যুগের ভোরে

উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট। দিনটি জাতির জীবনে বড় আনন্দের দিন। বড়ই স্মরণীর দিন।

ঐ দিন দিল্লীর লালকেল্লায় ভারতের জাতীয় পতাকা (নিশান) উঠল। ঐ দিন অগণিত ভারতবাসী এক সুরে গেয়ে উঠেছিল—

এ দিন আজি কোন ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা আর সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট।

ভারতবাসী কত আশা-নিরাশার ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিল এই দিনগুলি। অবশেষে এসেছিল জীবনের সেই পরম লগন।

এই কদিনের মধ্যে কত ঘটনাই না ঘটেছিল।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা ঘটেছিল ১৬ই আগস্ট। আর ২রা সেপ্টেম্বর ভারতের অন্তবর্তী (মাঝখানে কিছুদিনের জন্য) সরকার গঠিত হল।



জাতীয় পতাকা হাতে মিছিল

জহরলাল নেহরু হলেন প্রধানমন্ত্রী।

মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগ দেয়নি। কিন্তু অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিল। তার মানে মুসলীম লিগের নেতারা ঐ সরকারের মন্ত্রী হয়েছিল।

কংগ্রেস দাবী করল—গণপরিষদে যোগ দেয়নি মুসলিম তাই। তাই অন্তবর্তী সরকারে থাকার অধিকার নেই মুসলিম লিগের।

এ নিয়ে গোলমাল চলতেই থাকল। এমন সময় ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন—বিদেশী সরকার উনিশশো আটচল্লিশ সালে ভারত ছেড়ে চলে যাবে—জুন মাসের মধ্যেই। তারপর—

ওয়াভেল ভারত ছেড়ে দেশে ফিরে গেলেন।
গভর্ণর জেনারেল হয়ে, মাউণ্টব্যাটেন এলেন॥
ম্যাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করলেন জারি।
ভারত স্বাধীন হবে খুব তাড়াতাড়ি॥

ভারতকে সেকারণে ভাগ করা চাই।
তাছাড়া সমস্যার সমাধান নাই ॥
কংগ্রেস প্রথমে তা চায়নি মেনে নিতে।
অবশেষে মেনে নিল, দেশ ও দশের হিতে ॥

তখন দেশবিভাগের জরুরী কাজগুলি করার জন্য পার্টিশান কমিটি গঠিত হল। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা এ কমিটির সদস্য হলেন।

ওদিকে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে (জন প্রতিনিধি সভা) ভারতের স্বাধীনতা আইন মঞ্জুর করা হল।

সে আইনে বলা হল—

ভারতকে দুটি ভাগে হবে ভাগ করা।
একদেশ থেকে হবে, দুটি রাষ্ট্র গড়া ॥
যে সব অঞ্চলে বেশী আছে মুসলমান।
সে সব অঞ্চল নিয়ে হবে পাকিস্তান ॥
বাকি অংশ নিয়ে হবে গঠিত ভারত।
দেশীয় রাজ্য আছে যত নিজ ইচ্ছামত ॥
ভারত বা পাকিস্তানে পারে যোগ দিতে।
কেউ যদি চায়, পারে স্বাধীন থাকিতে ॥

কোন্ কোন্ অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হল? সেইসব অঞ্চলের নাম—

পূর্ববঙ্গ, শ্রীহট্ট, সিন্ধু, আর বেলুচিস্তান,
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ; পাঞ্জাবের আধখান
(পশ্চিম পাঞ্জাব)।
এসব অঞ্চল নিয়ে হল পাকিস্তান ॥

কিছুদিন পর—

কাশ্মীর ভারতের সাথে যোগ দিল।
ভারত হায়দরাবাদ দখল করিল ॥

তারপর কি হল ?—

তারপর দুঃখের রাত পোহাল, ফরসা হল। অরুণোদয়ের আলোয়, গাঁয়ে শহরে, পথে-ঘাটে বের হল জনতার মিছিল।

শাঁখ বাজল। প্রভাত ফেরী শুরু হল। মিছিলের মুখে গান আর গান—ওরে নতুন যুগের ভোরে।

শুরু হল নতুন যুগ। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল।

ভারতবর্ষ এখন শুধু ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্তান নয়। ভারতবর্ষ এখন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র।

ভারতবর্ষ এখন বিশ্বে সাড়া জাগানো গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক দেশ। আমরা সে দেশের স্বাধীন নাগরিক।